অমিয়সাগর

রঞ্জন সেন

পরিবে

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
পরাণচন্দ্র রায়
সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪/সি, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকা[illegible]

গরলের জ্বালায় যাঁদের প্রাণান্ত, অমিয় সাগরে ডুব দিলে তাঁদের শান্তি। কিন্তু সে সাগরের সন্ধান মেলে কোথায়। যদি বা মেলে, অমৃতকে গরল ভেবে সরে যায় দূরে; মরীচিকার মতো শেষে গরলের হাতছানি তাকে ভোলায়। তারপর আক্ষেপ, 'অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

কথাগুলি বলতে হ'ল, আজকালকার কথাসাহিত্যের পাঠক পাঠিকাদের, যাঁরা পাঁচ লাইন পড়েই গল্প-উপন্যাস পড়া অথবা না পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। গরল যাঁদের লাগে অমৃতবৎ। তাঁদের কাছে এটা কোন সুখবরই নয়, এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ এক নতুন বিষয় বস্তু নিয়ে লেখা। তবে একথা ঠিক, পড়া শেষ করে পাওয়া যাবে নতুনত্বের স্বাদ; কেননা, এতে অভিজ্ঞতার বাইরের একটি কথাও নেই। যে পরিবেশ আমার পরিচিত, যাঁরা আমার একান্তভাবে চেনা, যে শিল্পের মজতুরীতে নির্ভর করে আমার অস্তিত্ব, সেই সব অভিজ্ঞতার ফসল 'অমিয়-সাগর।'

উপন্যাসটি যখন ক্ষুদ্র কলেবরে একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন কয়েকজন ভেষজশিল্প বিশেষজ্ঞ আমাকে নানা উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করেন। তাঁদের পরামর্শেই গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই কলেবর বৃদ্ধি। এটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সার্থক হবে আমার শ্রম।

পরিশেষে, উপন্যাসের মুকুরে কেউ নিজের চেহারা-চরিত্রের মিল দেখলে ধরে নিতে হবে সেটা কাকতালীয় ব্যাপার। নিবেদনমিতি—

রঞ্জন সেন

রঞ্জন সেনের পরবর্তী গ্রন্থ

একদিন অনেক রাত

১

ষ্টাফ্ কোয়াটারের তেতলায় কারখানার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস্ অনিতা শীল। রেলিংয়ে সমস্ত দেহের ভর দিয়ে। তাঁর দৃষ্টি ছিল পশ্চিমদিকে, যেখানে গঙ্গার ধারে আকাশের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে আছে চারতলা ম্যানেজমেণ্ট বাংলোটা। যার চারপাশের সৌন্দর্য নন্দনকাননের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

উদাস দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে কি ভাবছিলেন মিসেস শীল? যৌবনের রঙীন দিনগুলির কথা কি তাঁর মনে পড়ছিল? আজ ম্যানেজমেণ্ট বাংলোর যে ফ্লাটে মেটা দম্পতি ক্ষমতার শীর্ষে বসে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন, একদিন সেখানেই তাঁর জীবনের কয়েকটি বছর কেটেছে আনন্দের মধ্যে; সেকথা ভেবেই কি আজ এই বিষণ্ণ অপরাহ্নে গোপন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন মিসেস অনিতা শীল?

মিসেস শীলের পরিচয় আগেই পেয়েছি। তিনি বনস্পতি কারখানার প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজার ডাঃ চৌধুরীর কন্যা। ডাঃ চৌধুরীকে সব্যসাচী বলাই ঠিক। তিনি একহাতে সৃষ্টি করতেন, সংহার করতেন অন্যহাতে। দেবাদিদেবের মতই তাঁর ছিল সৃজন, পালন এবং লয়ে সমান আনন্দ। যে কারখানাটি এখন বিদেশী কোম্পানীর সম্পত্তি, এটা গড়েছিলেন তিনিই। বনস্পতির শাখায় আশ্রয় দিয়েছিলেন অনেককে। তারপর কি এক রুদ্র খেয়ালে মেতে উঠলেন তিনি, কেউ জানতে পারল না। বনস্পতি যখন তাঁর নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে সশব্দে ভূপতিত হল, তখন জানতে পারল সকলে, কি চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কারখানার অফিস বিল্ডিং টেরাসে দাঁড়িয়ে টবে লাগানো বাহারে গাছের সৌন্দর্য দেখছিলাম একমনে। হঠাৎ ষ্টাফকোয়াটারের দিকে তাকাতেই মিসেস শীলকে দেখতে পেলাম। একটা ক্লান্ত ভঙ্গীতে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। অস্তগামী সূর্যের কিরণ এসে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর দেহে। দেখে খুবই বিষণ্ণ মনে হল তাঁকে।

ভাবছিলাম, মিসেস অনিতা শীল কি ভাবছেন ওদিকে চেয়ে? এই অবস্থায় তাঁর পুরনো দিনের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক। নিশ্চয় ভাবছেন নিজের অদৃষ্টের কথা। নিশ্চয় মিসেস মেটার সৌভাগ্যে তাঁর ঈর্ষা হচ্ছে মনে মনে। কারখানার বর্তমান মালিকরা মিঃ মেটার কদর বুঝেছেন। ধাপে ধাপে উঠে গেছেন তিনি। ষ্টাফ্‌কোয়াটার থেকে বাংলোয়। জুনিয়ার থেকে সিনিয়ার কভেনেণ্টেড্ ষ্টাফ্। তারপর একেবারে কারখানার ম্যানেজার।

অথচ সে দিনও মিসেস মেটা নিজে বাজার করেছেন, রান্নাবান্না করেছেন, বাসন মেজেছেন নিজের হাতে। আর এখন? গাড়ী করে বাজার করতে যান নিউমার্কেটে; খানসামা, বাবুর্চি হুকুম তামিল করবার জন্যে সর্বদা মোতায়েন।

আর অনিতার স্বামী মিঃ শীল পিতার সুপারিশে চাকরী পেয়েছেন বিদেশী কোম্পানীতে। যেখানে ছিলেন, ঠিক সেই জায়গাতেই রয়ে গেছেন আজও। এতটুকু পদবৃদ্ধি হয় নি। অথচ মিঃ শীল কাজের দিক থেকে ডাঃ চৌধুরীর সুযোগ্য শিষ্য।

ম্যানেজমেণ্ট বাংলো থেকে মিসেস শীলকে বিদায় নিতে হয়েছে। মেটা দম্পতি একদা ছিলেন যে ফ্লাটে, সেখানেই রয়েছেন তাঁরা।

সমাজের উঁচু তলা থেকে নেমে আসার বেদনায় কি মুহ্যমানা মিসেস শীল? তিনি কি ভাবছিলেন, ষ্টাফ্‌কোয়াটার থেকে ম্যানেজমেণ্ট বাংলোর সামান্য দূরত্ব এতই অনতিক্রম্য? মাত্র একটি প্রাচীর এবং কয়েকহাতের ব্যবধান; মিসেস শীল হয়তো ভাবছেন, তাঁর স্বামী সারা জীবন চেষ্টা করলেও এ দূরত্ব ঘোচাতে পারবেন না।

*　　　*　　　*

বনস্পতির ঠিকুজি-কুষ্ঠি লিখতে গিয়ে প্রথমেই মিসেস শীলের কথা বলা হয়তো ঠিক হল না। এ অনেক পরের কথা। আগের কথা আগে ভাগেই ব'লে নেওয়া ভাল। নইলে কাহিনীর পারম্পর্য নষ্ট হবে। অতএব গোড়া থেকেই শুরু করি।

শুরু করতে গিয়েই মনে পড়ল ফটোগ্রাফার অসিতদাকে। আমার চোখ দুটো কি তাঁর দামী ক্যামেরাটার মত কেবলমাত্র একটা যন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে, যা দেখবে তারই ছবি তুলবে হুবহু? আমার কিন্তু তেমন ইচ্ছে নয়। তাই তুলি কলম হাতে নিয়ে বসলাম। অসিতদার মত ছবিতোলা আমার কর্ম নয়, আমার সাধ ছবি আঁকা।

অসিতদার মত মানুষকে ওপর-ওপর দেখেই আমার সাধ মেটে নি, আমি তাঁর হৃদয়ের খোঁজ করেছি সেই সঙ্গে। জানতে চেয়েছি তাঁর স্নেহের পরিমাণ কতখানি।

হ্যাঁ, চোখে না দেখেই বিশ্বাস করতে হয়েছে, স্নেহের একটা আধার আছে। হৃদয় হ'ল সেই আধার।

মানুষ মাত্রেরই হৃদয় আছে। কারও একেবারে খালি, কারও আছে স্নেহের ছিটে-ফোঁটা, কারও বা হৃদয় স্নেহে ভরপুর।

মানুষ দেখলেই আমি আগে খোঁজ করি তার হৃদয়ের সঞ্চয় কতখানি। বলতে আপত্তি নেই, আমি কাঙাল; স্নেহের কাঙাল। ওই জিনিষটির জন্যে আমি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করি। আমার মনোভাব আগ্রাসী নয় অবশ্য। হৃদয়ে হৃদয়ে স্নেহের ফল্গুস্রোত বইতে দেখলেই আমি সন্তুষ্ট। সেই স্রোত যে অবিরল ধারায় কেবলমাত্র আমার শিরেই বর্ষিত হবে, এমন অন্যায় দাবী কারো কাছে কোনদিন করি নি। যে কেউ স্নেহধন্য হ'ক, এতেই আমি সুখী।

স্নেহের সমুদ্রে সাঁতার দিয়েই আকাঙ্ক্ষা মেটে নি, যা ছিল অনুভবের

বস্তু, তাই এখন চাক্ষুষ করছি। সেই স্নেহই আমায় খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে ; সমাজে একটা সম্মানের আসন পেয়েছি এই স্নেহ পদার্থের দাক্ষিণ্যে। এই বিশেষ ধরণের স্নেহপদার্থের আসল নাম বনস্পতি। একে আমরা স্থান দিয়েছি উদরে। হৃদয়ের স্নেহ হৃদয়ে এসে জমতেই থাকে উদরে বনস্পতির নিত্য যাওয়া-আসা।

এই বনস্পতি কারখানার আমি একজন ভাগ্যবান কেরানী।

ভাগ্যবান তো বটেই। বনস্পতিই খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে ; সমাজে পরিচিতি দিয়েছে মোটা মাইনের চাকরে বলে। আশপাশের স্বল্পবেতনের শ্রমিক আমার বেশভূষার চাকচিক্য অবাক হয়ে দেখে। আমি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করি মনে মনে।

স্নেহের কাঙাল কেমন করে স্নেহের সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম, নুনের পুতুলের মত নোনা জলে মিলে মিশে এক হয়ে গেলাম, বনস্পতি কারখানার কেরানীর চাকরী ছেড়ে অধ্যাপনার মত সম্মানের বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ পেয়ে হারালাম কোন্ আকর্ষণে, সেই কথাই বলব।

বিদ্যালয়ের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সহায় সম্বলহীন সত্তরটাকা মাইনের কেরানীর এ এক বিচিত্র পথ পরিক্রমার কাহিনী। মানুষ গড়ার কারখানা থেকে স্নেহপদার্থ উৎপাদন কেন্দ্রে যাত্রা। যাত্রাপথে নিত্য দেখা হয়ে চলেছে সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। কারখানার ডাচ্ ম্যানেজার মিঃ উইলিয়ম টেম্পলকে দেখেছি, দেখেছি তাঁর বয়সে বুড়ী অথচ চেহারা এবং আচরণে খুকী মেমকে ; দেখেছি—ডাঃ অনঙ্গমোহন চৌধুরীর জার্মান স্ত্রীর সুন্দরী মেয়ে অনিতাকে—মিসেস অনিতা শীল—, দেখেছি এ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ বারট্রাণ্ড ব্রাউনকে, যিনি আমায় নিয়োগ করেছিলেন। আরও দেখেছি পঞ্চনদ দুহিতা বসুন্ধরা আর তার রঙীন কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ সুজন সিংকে। আরও কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার এই যাত্রাপথে।

আমি তাঁদের সবাইকে দেখেছি। কখনো কাছে, কখনো দূর থেকে। তাঁদের হৃদয়ের সন্ধান করেছি। দেখেছি, কারও নেই বিন্দুমাত্র স্নেহের

সঞ্চয়, কারও ছিটে-ফোঁটা আছে, কারও বা হৃদয়ে টল টল করছে ভাদ্রের ভরা নদীর মতো।

এই বনস্পতি কারখানা আমার কাছে যেন সারা বিশ্বের প্রতিরূপ। বনস্পতির শাখায় যেমন আশ্রয় নেয় নানা জাতের পাখীরা, তেমনি এই কারখানাকে আশ্রয় করে মিলিত হয়েছে শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের মানুষও।

আমি ছিলাম স্কুলের সত্তরটাকা মাইনের কেরানী। একেবারে একা। অর্থাৎ মা বাবা স্বর্গে গেছেন; ভাই-বোন নেই। থাকতাম স্কুলের কাছেই একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। গৃহকর্ত্রীর দাক্ষিণ্যে আমার অংশ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁকে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল স্নেহহীনা, কিন্তু পরে এ ধারণা বদলেছিল।

স্কুলের ছুটির পর রায়-ষ্টুডিওতে যেতাম। ফটোগ্রাফার অসিতদাকে ভালো লগত। তাঁকে সাহায্য করতাম কিছু কিছু। অসিতদা দোকান বন্ধ করলে মেস থেকে খেয়ে বাসায় ফিরতাম। এসে অনেক রাত অবধি জেগে লেখাপড়া করতাম। পড়তে পড়তেই ঘুমে চোখ বুজে আসত। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তাম।

অসিতদা ভারী মিশুকে। তাঁর দোকানে তাই খদ্দেরের ভীড় লেগেই থাকত। বেশীর ভাগ আসত মেয়েরা। অসিতদার কথা-বার্তায় জড়তা নেই, সঙ্কোচের ধার দিয়েই যান না তিনি। মা-মাসী শ্রেণীর মহিলাদের তো বটেই, বোন-বৌদিদেরও মুখের পোজ ঠিক করে দেন। বয়স অনুযায়ী বুকের কাপড়ের অবস্থানও ঠিক করে দিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন না।

বেশীর ভাগ সন্ধ্যে থেকেই খদ্দের আসতে সুরু করত। রাত্রে হাই পাওয়ারের আলোয় ভালো ফটো তোলা হয়। পরীক্ষার আগে আগে পাসপোর্ট সাইজের ফটোর জন্যে গিজ গিজ করত ছাত্রছাত্রীরা। অসিতদা হিমসিম খেতেন তখন। আমাকে পেয়ে খুশী হতেন। বিনি মাইনের লোক পেয়ে খুশী তো হবারই কথা। আমি ফটো ষ্ট্যাণ্ড উঁচু

নীচু করে দিতাম, ক্যামেরা ফিট্ করে দিতাম। রসিদ কেটে পাওনা বুঝে নিয়ে ফটো ডেলিভারী দেওয়া পর্যন্ত সবই করতাম। বিনিময়ে অসিতদা মিষ্টি কথা বলতেন, প্রত্যহ চা এবং তার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে সিঙাড়া, মিষ্টিও খাওয়াতেন।

সেদিন ঘুম ভেঙ্গে যেমন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। মাথার ঠিক মাঝখানে ধপাস করে পড়ল একটা টিকটিকি। শুনেছি, মাথায় টিকটিকি পড়লে নাকি মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

তখন আমার একমাত্র কামনা ছিল, ভাল একটা চাকরীর। স্কুলে সত্তর টাকা মাইনের কেরানীর জীবন দুর্বিষহ মনে হয়। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অনেক করেছি। প্রাইভেটে বি. কম পাশ করেছি। বাস করছি বাংলার শিল্পাঞ্চলে। তবু কোথাও কিছু সুবিধে করতে পারি নি। অনেককে বলে বলে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছি। ভাল চাকরী, ঘর-সংসার, সম্মান-প্রতিপত্তি ইত্যাদি উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো অনেকদিন মুছে দিয়েছি মন থেকে।

কিন্তু বাদ সাধল টিকটিকিটা। ওটা আমার মাথায় পড়ে মনের স্থির দীঘিতে ঢিল ফেলে দিল। আমি সন্তর্পণে টিকটিকিটা মাথা থেকে ফেলে জোড়হাতে মনের ইচ্ছা জানালাম—একটা ভালো চাকরী হ'ক আমার। এই ঘরেই তো বাস করছ বিনা ভাড়ায়; মাঝে মাঝে চেপো আমার মাথায়। ক্রমে ক্রমে মনের কামনা জানাব। ঘর, সংসার—কিন্তু সে পরে; এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা, একটা মনের মত চাঁকরী।

আর একটা ঘটনা ঘটল বিকেলে। তখনো আমি নিবিষ্টমনে কাজ করছি স্কুলে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। শিক্ষকরা বাড়ী চলে গেছেন।

দরজার কাছে লঘু পায়ের আওয়াজ হয়েছিল হয়ত, খেয়াল করি নি। কাজ করতে করতে মিষ্টি প্রসাধনের একটা গন্ধ নাকে আসছিল। কারণটা বুঝবার মত ফুরসৎ ছিল না। হঠাৎ বাঁশীর মত মিষ্টি নারীকণ্ঠের

আওয়াজে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাকিয়ে দেখি, ছবি দাঁড়িয়ে। এই পাড়ারই মেয়ে। তাকে ভালভাবেই চিনি, কিন্তু তেমন আলাপ কোনদিনই হয় নি। ছবি কি দরকারে আমার কাছে আসতে পারে, ভেবে উঠতে পারলাম না।

আমাকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়াতে দেখে ছবি অবাক হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিংগুলোর ওপর। আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, একটা টিকটিকি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার মুখের ওপর মুখ দিয়ে রয়েছে।

আর বেকুবের মত আমি একটা কথাই ভেবে বসলাম। সংসার হবে নাকি আমার ? ছবি হবে সেই সংসারের লক্ষ্মী ?

অস্বীকার করব না। হঠাৎ ছবিকে দেখে এমনি বেকুবই হয়েছিলাম আমি। আমার মুখ থেকে কোন কথাই বার হল না।

ছবিই কথা বলল—হেডমাষ্টারমশায় চলে গেছেন ?

আমি দৃষ্টি নত করে জবাব দিলাম—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, স্কুল থেকে আমি টেষ্ট দিতে পারব কিনা বলতে পারেন ?

— কাল এগারোটায় এলে জানা যাবে।

—আপনি বলতে পারবেন না ?

—না।

—ও, আচ্ছা নমস্কার।

ছবি চলে যেতেই আমি আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম। অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে। মাস শেষ হয়ে এল ; ক্যাশবইয়ে কয়েকদিন জমা-খরচ তোলা হয় নি। একুইট্যান্স রেজিষ্টারের কাজটা আজই শেষ করে ফেলতে হবে। দু' একটি চিঠিপত্রও টাইপ করার আছে।

কাজ করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে এল। স্কুল থেকে সোজা গেলাম রায়-ষ্টুডিওয়। দেখলাম, অসিতদা দুই বিবাহিতা মহিলার স্ন্যাপ নেবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। সম্পর্কে ওরা দুই জা। একজন সদ্যবিবাহিতা বলে বোধ হয়। বড় জা' চেয়ারে বসেছেন, ছোট বসেছেন চেয়ারের হাতলে।

বড় পরেছেন দামী ঢাকাই শাড়ী, আর একজনের পরণে ষ্ট্র্যাপ দেওয়া কালোপাড় শিল্কের শাড়ী। গা ভরতি গয়না।

অসিতদা পোজ ঠিক করতে গিয়ে অভ্যাস বশতঃ বড় জায়ের চিবুকে হাত দিতেই তো তিনি খিল খিল করে হেসে সারা। সে-হাসির ছোঁয়া লাগে ছোট জায়ের মুখেও। দুজনের খিল খিল হাসি আর থামতেই চায় না। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে হাসতে হাসতে।

অসিতদা মৃদু ভর্ৎসনা করছেন—আঃ বৌদি, থামুন না, এমন হাসলে কি করে কি হয়। আমার হাই-পাওয়ারের আলো জ্বলছে—মিটার উঠছে—

ওঁরা চেষ্টা করে গম্ভীর হন। অতখানি গাম্ভীর্য আবার অসিতদার না-পসন্দ্। তিনি নির্দেশ দেন—অত গম্ভীর কেন আবার, মুখখানা হাসি হাসি করুন—আর একটু—আরে কি মুসকিল।

ওঁরা দুজনে আবার খিল খিল করে হেসে ওঠেন।

আমি এগিয়ে গেলাম। আমার চেহারায় কি ছিল জানি না, মহিলাদুটি আমাকে দেখেই হাসি থামিয়ে মাথায় ঘোমটা টানতে গেলেন।

অসিতদা যেন বাঁচলেন। আমাকে শিখণ্ডীর মত পাশে দাঁড় করিয়ে তাঁর ব্যাকরণ শুরু হল। বক্ বক্ করতে করতে এগিয়ে গেলেন ওঁদের দিকে। মাথার ঘোমটা নামিয়ে দিলেন। চিবুক ধরে পোজ ঠিক করে নিলেন দুজনার। ওঁরা অসিতদার নির্দেশ মেনে নিলেন, দমফাটা হাসি এসে আর ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন না। নির্বিঘ্নে ততক্ষণে ফটো তুলে নিলেন অসিতদা।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন—ভাগ্যিস তুমি এই সময়ে এসে পড়েছ। বৌদিরা বড্ড ভুগিয়েছেন।

বড় জা' বললেন—আপনি যদি কাতুকুতু দেন তো হাসব না?

অসিতদা প্রায় মারমুখো হয়ে ওঠেন—দিলামই বা। এত বয়স হল, এখনও গা-সওয়া হয়নি?

কোনো মহিলাকে এই ধরণের কথা বলা আমি কল্পনাও করতে পারি

না। অসিতদার পক্ষে সবই সম্ভব। মনের মধ্যে ওঁর কুভাব নেই বলেই হয়ত অনায়াসে এমন রসিকতা করতে পারেন।

আমার উপস্থিতিতেই তিনি এ ধরণের কথা বলবেন, এটা ভাবতে পারি নি। ভাবলাম, একথা শুনে মহিলা বুঝি এক্ষুণি অসিতদাকে অপমান করে বসেন। ঠাস করে চড় না মেরে বসেন অসিতদার গালে। কিন্তু তেমন অঘটন কিছু ঘটল না। ছোটজায়ের হাতখানা ধরে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি রোধ করতে করতে তিনি প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

অসিতদা পেছন থেকে চীৎকার করে বললেন — হপ্তাখানেক বাদে ফটো পাবেন।

রায়-ষ্টুডিওতে সেদিন এমনিই বেড়াতে এসেছিলেন হরুদা। হরদেব গাঙ্গুলি। অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ। রূপ আর গুণের এমন একত্র সমাবেশ এর আগে নজরে পড়ে নি। কিন্তু সে বিষয়ে উনি সচেতন নন। তাই ক্ষুরধার বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আই.এস. সি. কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়। ধনী পিতার সন্তান হয়েও পোষাকে আষাকে, আলাপে-আচরণে তিনি অতি সাধারণ। চাকরী ধরেন যেমন, ছাড়তেও তেমনি দেরী করেন না।

অসিতদার মুখেই শুনেছি, হরুদা সম্প্রতি বনস্পতি ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানীর চাকরী নিয়েছেন টাইম-কীপারের। এক মাড়োয়ারীর মূলধন নিয়ে কারখানাটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডাঃ অনঙ্গমোহন চৌধুরী। তখন এর নাম ছিল হিন্দুস্থান ভেজিটেবল মেকার্স। উনিশশো পঞ্চাশ সালে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাচ কোম্পানী কারখানাটা কিনে নেয়। এই বিদেশী কোম্পানীতে কাজ করতেন হরুদার এক আত্মীয়। পঞ্চাশ সালেই তাঁর চাকরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দু'বছরের জন্যে এক্সটেনসান দিয়ে তাঁকে কলকাতা অফিস থেকে কোম্পানী পাঠায় কারখানায়। এ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্ট অরগনাইজ করতে। সেই আত্মীয়ের সহায়তায় হরুদা সেখানে ঢুকেছেন।

হরুদাকে দেখেই অসিতদা বলে উঠলেন—হরু, এস এস। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি।

হরুদা বসতে বসতে বললেন—এত খাতির করে ডাকলে যখন, এা খাওয়াও।

—খাওয়াচ্ছি। সত্য, তিন কাপ চা দিতে বলো ত ?

চায়ের অর্ডার দিয়ে এলাম। অসিতদা বললেন—ভাল কথা মনে পড়ল। আচ্ছা হরু, তোমাদের নতুন কারখানায় লোক নেবে না ?

ষ্টুডিওর দেওয়ালে সেই মুহূর্তে একটা অতিকায় টিকটিকি টক্ টক্ করে উঠল।

ইতিমধ্যে চা দিয়ে গেল। হরুদা সবেমাত্র একটা বিড়ি ধরিয়েছিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাঁর আকর্ণবিস্তৃত পল্লববহুল চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর প্রসারিত করে জবাব দিলেন—সত্যর জন্যে জিজ্ঞাসা করছ নিশ্চয়।

অসিতদা অনুরোধ করেন—দাও না, পার যদি ওকে ঢুকিয়ে দিতে।

শুনে হরুদা আবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে যেন আমাকে পাঠ করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেইদিনটির কথা মনে পড়ে গেল আমার। নিশাদির ঘরে আমার সম্বন্ধে নিশাদিকে যে উক্তি করেছিলেন তিনি।

নিশাদি স্থানীয় এক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন। কয়েকদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ শুনে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। নিশাদির ঘরে ঢুকে থতমত খেয়েছিলাম প্রথমে। ঘরে জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে। খাটে লেপ মুড়ি দিয়ে নিশাদি অর্ধশায়িতা। তাঁর পায়ের কাছে তাঁরই লেপে পা ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছেন হরুদা।

সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হল নিশাদির সঙ্গে। আমাকে তিনি খাটেতেই বসতে বললেন। হরুদাকে সমীহ করি বলেই বসতে পারি নি। নিশাদির অসুস্থতা সম্পর্কে দু'চারটি কথাবার্তা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে

আসছি, এমন সময় হরুদার মন্তব্য কানে এল—ছেলেটা হীরের টুকরো বললেও কম বলা হয়। মামার বাড়ীতে মানুষ; জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করেছে।

নিশাদির কথা আর কানে আসে নি। ছুটেই একরকম পালিয়ে এসে-ছিলাম সেদিন।

হরুদা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কাল সকাল সাতটার আগে কারখানার গেটে গিয়ে দেখা করো আমার সঙ্গে।

আমি বেকুবের মত বলে বসলাম—গিয়ে কি হবে? আমার অদৃষ্টে ভাল কিছু নেই।

হরুদা ধমকে উঠলেন—থামোতো হে ছোকরা। যা বললাম, মনে রেখো।

ষ্টুডিওর দেওয়ালে টিকটিকিটা আবার টক্ টক্ করে উঠল।

অসিতদা বললেন—সত্য, কথাটা মনে রেখো, কাল সকাল সাতটা। ভুল না হয়।

আমি তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আরও হয়ত কিছু বলেছিলেন, আমার আর কিছু কানে যায় নি।

বাসায় ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, কি আশ্চর্য ব্যাপার! মাথায় টিকটিকি পড়লে অঘটন সত্যিই ঘটে। অন্ততঃ, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হরুদার দয়ায় চাকুরীটা হলেও হতে পারে।

কি জানি কেন, আলো নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই অন্ধকারে ছবির ছবির মত মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। না, একসঙ্গে দুটো অঘটন ঘটা সম্ভব নয়।

২

পাকা রাস্তার বুক চিরে রেললাইন ঢুকে গেছে কারখানার ভেতরে। কাঠের গেট বন্ধ। তার কিছুটা অংশ দরজার মত ব্যবহৃত হয়। গেট বন্ধ থাকলেও তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করা যায়। কারখানার প্রবেশ পথের বাঁদিকে ব্রাসপ্লেটে কোম্পানীর নাম লেখা। নীচে রেজিস্টার্ড হেড্ অফিসের ঠিকানা।

সাড়ে ছ'টার কিছু পরেই গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যে একটা ধুকপুকুনি শুরু হল; পরীক্ষার হলে ঢোকবার আগে পরীক্ষার্থী সচরাচর যেমনটি অনুভব করে থাকে।

পৌনে সাতটায় হুটার বেজে উঠল। দলে দলে শ্রমিকরা কারখানায় ঢুকছে; খাঁকি রংয়ের ইউনিফর্ম তাদের পরণে। বুক পকেটের কাছে কোম্পানীর নামের প্রথম অক্ষরগুলি বোনা—ভি. এম. সি.।

কিছুক্ষণ পরেই হরুদা এলেন। গেটের কাছে ধুতি, পাঞ্জাবী পরিহিত অবস্থায় আমাকে দেখেই যেন তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন। রাগে মুখ চোখ লাল করে বললেন—খুব বুদ্ধি তো দেখছি তোমার?

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম।

হরুদা আরও রেগে গেলেন—এই পোষাকে বিলিতি কোম্পানীতে কেউ ইন্টারভিউ দিতে আসে?

আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম তাঁর কথা শুনে। বেকুবের মত বলে বসলাম—আমায় তো কিছু বলে দেন নি?

হরুদা তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ করলেন—এমনিতে তো প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি কতদিন। এর বেলা বলে দিতে হবে বুঝি? এই সাধারণ জ্ঞানটুকু নেই?

আমি অপরাধীর মত মাথা নত করলাম। সত্যি বলতে কি, খুবই দুঃখ হল হরুদার কথায়। অভিমান হল কিছুটা। হরুদার হৃদয় কি শূন্য? স্নেহের ছিটে-ফোঁটা নেই সেখানে? কাল বলে দিতে কি দোষ ছিল তাঁর।

যদিই বা আমি ধূতি পাঞ্জাবি পরে এসে থাকি, বিদেশী মালিকের কাছে সেটাই কি আমার মনোনয়নের বিরুদ্ধে যাবে?

আমার বন্ধুরা বলে,—তোর ফিগার ভালো নয়, প্যাণ্ট পরলে তোকে মানায় না। তার চেয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেই তোকে বেশী স্মার্ট দেখায়। তাই না আমি এই পোশাকে এসেছি। তাছাড়া, এতো আমাদের জাতীয় পোষাক। আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ। হলোই বা বিদেশী কোম্পানী। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ইন্‌টারভিউ দিতে এসেছি বলে যদি চাকরী না হয় তো নাই হল। আমার সেই সত্তর টাকা মাইনের স্কুলের চাকরীই ভালো।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হরুদা রূঢ়স্বরে বললেন—যাও, পোশাক বদলে এস শীগ্‌গীর। এসে খোঁজ করো আমাকে।

তারপর গেটের গহ্বর দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন হরুদা।

চোখে সহসা রাশি রাশি সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। পোষাক বদলে আবার আসব কিনা ভাবতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। মনস্থির করতে না পেরে গেটের সামনে থেকে চলে এলাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

বাসায় ফিরে ভাবলাম কিছুক্ষণ। কি করি? যাব কি যাব না?

শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেললাম, যাব। ভাল চাকরীর সম্ভাবনাটাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে ইচ্ছে হল না।

পোষাক বদলে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম ঘণ্টাখানেক পরে। হরুদার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়ে গেটে কর্মরত দারোয়ানের মারফৎ ভিজিটিং স্লিপ পাঠানো হল।

গেটের বাইরে হরুদার ডাকের আশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে ব্যথা ধরে গেল। তবু পাত্তা নেই হরুদার। সেই দারোয়ান কিছুক্ষণ বাদেই

ফিরে এসে জানাল, বাবু আসবেন এখুনি। কিন্তু হরুদা আজও আসছেন, কালও আসছেন।

বুঝলাম, হরুদা নিশ্চয়ই কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। আসার সময় করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু দেরী হচ্ছিল বলে আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। মিছিমিছি আমাকে না আজকে স্কুল কামাই করতে হয়।

অনেকক্ষণ বাদে হন্তদন্ত হয়ে এসে হরুদা বললেন—মিঃ ব্রাউন আজ বড় ব্যস্ত, শনিবার কিনা? তুমি পরশু ঠিক সাতটার সময় এসো, কেমন? মনে মনে হাসলাম আমি। ভাগ্যদেবতা কি এত সহজেই প্রসন্ন হবেন? তেমন কপাল করে কি জন্মেছি?

আগেই জানতাম, বাধা আসবেই। শনিবারের অজুহাত সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গড়াবে। আমার ইণ্টারভিউ কোন দিনই হবে না। ভাল চাকরি হবার কোন আশাই নেই। মাথার ওপর টিকটিকির পতন আশার ছলনামাত্র। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার ছবিকে টিকটিকির চুম্বন, রায় ষ্টুডিওর দেওয়ালে তার টক্ টক্ আওয়াজ আমাকে ভেংচি কাটা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার পাথর চাপা কপাল। জানতাম, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে না।

—আচ্ছা। এই একটিমাত্র বাক্য ব্যয় করে আমি চলে এলাম কারখানার গেট থেকে।

মাঝখানে পুরো একদিন সময়। বসে বসে আকাশ পাতাল কত কী ভাবলাম। মন দুলছিল সন্দেহদোলায়। গেলে কাজটা হবার সম্ভাবনা আছে। না গেলে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখাই সার হবে। সমস্ত ভাল ভাল কাজে বাধা তো আসবেই। এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। কত বাধা কাটিয়ে তবে লেখাপড়া করতে হয়েছে। কত ভালয়-মন্দয় মামার আশ্রয়ে প্রতিপালিত। কোন কিছুতেই দমিনি।

এখন ক্রমশঃ দমে যাচ্ছি। সত্তর টাকা মাইনের কেরানীর জীবন কি ক্রমশঃ আমাকে অনাদরে রাখা বর্ষার দেশলাইয়ের মত মিইয়ে দেয়নি? তা না হলে এমন ইতস্ততঃ করছি কেন? ঝুঁকি না নিলে গতানুগতিক

জীবন যাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত হব কেমন করে ?

মনটাকে শক্ত করে ফেললাম। হ্যাঁ, যাব, এ সুযোগ হেলায় হারানো চলবে না। হরুদার রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সাহেব সুবো লোক ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত জেণ্টেলম্যান দেখলে হয়ত পত্রপাঠ বিদেয় করে দিতেন। এটা আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা উচিত ছিল। আর গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে যাবে, এটা কি করে সম্ভব। সাহেবদের হাতে কি কাজের অন্ত আছে ?

রবিবার বিকেলে রায়-ষ্টুডিও যেতেই অসিতদা হাতের কাজ ফেলে কৌতূহলী হলেন—কি খবর সত্য ?

ম্লান হেসে বলি—কাল গিয়েছিলাম। হরুদা বললেন, সাহেব বড় ব্যস্ত ; সোমবার যেতে বলেছেন।

অসিতদা পিঠ চাপড়ে বলেন—হরু যখন রয়েছে, তখন আর ভাবতে হবে না। নিশ্চয় হয়ে যাবে দেখো। আমায় কিন্তু খাইয়ে দিতে হবে।

সোমবার সাতটার কিছু আগে কারখানার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যে সেই ধুকপুকুনি।

শুনলাম হরুদা ইতিমধ্যে এসে গেছেন। ভয় হল ; হরুদা নিশ্চয় রাগ করেছেন। আর ক' মিনিট আগে এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হত। কারখানায় ঢুকতে এত ঝামেলা পোহাতে হত না। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল খুব।

ভিজিটিং স্লিপ পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনের খাবারের দোকানটায় খদ্দেরের অসম্ভব ভীড়। কিছু খেয়ে আসি নি। কিন্তু খেতে ঢুকলে যদি এদিকের ক্ষতি হয় ? দরকার নেই খেয়ে ; পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ পরেই দারোয়ান এসে জানাল, গাঙ্গুলিবাবু যেতে বলেছেন। এই প্রথম দুর্গা বলে কারখানার গেট পার হলাম।

যে জমির ওপর কারখানা অবস্থিত, তার পরিসীমা আঁকলে দেখাবে ঠিক পেট মোটা কুঁজোর মত। গেট থেকে টাইম অফিস পর্যন্ত সরু

ফালিটুকু বেশ লম্বা ; কুঁজোর মুখের মত। টাইম অফিস থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত সুপরিসর জমির ওপর ফ্যাক্টরী-প্ল্যান্টস্, অফিস, ওয়ারহাউস, অয়েলরিসিভিং শেড্, ষ্টোর্স প্রভৃতি পাশাপাশি রয়েছে। পরে এসব দেখেছি। আর এও জেনেছি, এ জমি ছিল নাকি গৌরী সেনের। যিনি প্রয়োজনে টাকা দেবার প্রবচনে পরিণত। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

সরু ফালি জমির ওপর দিয়ে বিসর্পিল রেললাইন পাতা। সুন্দরীর গলায় হারের মত মনে হল প্রথম দর্শনে।

গেটের ভেতরে ঠিক বাঁদিকেই মস্ত বড় একটা বটগাছ। তারই ছায়ায় টালির আচ্ছাদন দেওয়া গেট্‌লজ। সুদৃশ্য, ছোট ঘরটাতে আসবাব বলতে একটি টেবিল, আর একটি টেবিল ফ্যান। গেট-লজ কীপার গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর ইঙ্গিতে একজন দারোয়ান আমাকে নিয়ে চললো হরুদার কাছে।

ছুপাশে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে এগিয়ে গেলাম। কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঠিক আয়নার মত। পথের বাঁদিক বরাবর সযত্নে ছাঁটা মেহেদীর বেড়া সোজা চলে গেছে টাইম অফিস পর্যন্ত। বেড়ার ওপাশে নানান ধরনের গাছপালা। কাস্নুনাট আর কৃষ্ণচূড়া গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে।

রাস্তার ওপর সন্থ পড়া কয়েকটি কাস্নুনাট। তার ওপর দিয়ে বোধ হয় লরী চলে গেছে। কোন কোনটার খোলা থেঁতলে গিয়ে বাদাম দেখা যাচ্ছে। প্রলম্বিত মেহেদীর বেড়ার মাঝামাঝি যায়গায় একটা গেট ; তার ওপরে লোহার পাইপ এবং জাল দিয়ে তৈরী আর্চ। তাকে সহস্র বাহু মেলে আলিঙ্গন করে আছে সুগন্ধি ফুলে ভরা যুঁইয়ের লতা।

কিছুদূর গিয়ে পথটা ছু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। বাঁদিকের পথটা সোজা চলে গেছে ম্যানেজমেণ্ট বাংলো আর জেটি পর্যন্ত। ডানদিকের পথটা টাইম অফিসের গেট পর্যন্ত গেছে। ছুই পথের মাঝখানে একটি ত্রিকোণ পার্ক। এখান থেকে পথের ছুধারেই রকমারী গাছে বাহারী

ফুলের অপূর্ব সমারোহ।
ডান দিকের পথে বাঁক নিতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালাম। দারোয়ান পাশে পাশে আসছিল। সেই দৃশ্য দেখে তার আর অগ্রসর হতে সাহস হল না। সামনেই টাইম-অফিসটা দেখিয়ে দিয়ে পিছু হটল সে।
আমি এগিয়ে যাব কি পিছিয়ে আসব, সহসা বুঝে উঠতে পারলাম না। দারোয়ানটি গেটে ফিরে যেতে যেতে পিছন ফিরে আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে সাহস দিল—আপ যাইয়ে না বাবু—ওহি হ্যায় টাইম-আপিস—কুছ হরজা নেই—যাইয়ে—
দ্বিধাজড়িত পদে এগিয়ে গেলাম।
ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের এক কোণে বড় বড় কলাফুলের গাছে হলুদ, লাল ফুল। সেই রং-এর ছোপ-লাগা একটা টাইট ব্রেষ্ট মাত্র গায়ে। লজ্জা নিবারণে প্রায় অক্ষম একটা নিতম্ব ঢাকা জাঙ্গিয়া মাত্র পরে মিসেস টেম্পল পুষ্প চয়ন করছেন। তাঁর পরিচয় অবশ্য পরে জেনেছি। মাথায় তাঁর বাদামী রং-এর এক মাথা চুল। বব্ ছাঁট, বলাই বাহুল্য। দেহে কোথাও মেদের লক্ষণ নেই। হঠাৎ দেখলে কিশোরী বলেই ভ্রম হবার সম্ভাবনা। আমার অতখানি ভুল না হলেও তাঁকে পূর্ণা যুবতী বলেই মনে হয়েছিল প্রথম দর্শনে।
এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়েই লজ্জায় আমার মাথা আপনিই নুয়ে এল। মাথা নত করে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম টাইম-অফিসের দিকে।
হরুদা এবং আর একজন টাইম-কীপার মিঃ মুখার্জীকে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পেলাম সেখানে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে হরুদার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর পল্লব বহুল বড় বড় চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এবং ভৎসনা শোনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।
আমাকে দেখে হরুদা সে সব কিছুই করলেন না। শান্ত গলায় তিনি বললেন—ব'সো।

আমি একটু অবাক হলাম। ভাবলাম, তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে আমাকে কটু কাটব্য করা তাঁর ইচ্ছা নয়। কিম্বা হয়ত আমার বিলম্বে আসাটা তিনি দোষের মধ্যেই ধরেন নি।

সামনের চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। ডাইনে, বাঁয়ে এবং পিছনে দরজা। ডাইনের দরজার বাইরে একফালি লন দেখা যাচ্ছিল। সেখানেও বাহারে গাছ। চারপাশে ফুল আর ফুল। লনের ওপাশে পাশাপাশি। এরপরও আধঘণ্টাখানেক মিঃ ব্রাউন কয়েকবার নিজের ঘরে ঢুকলেন, বেরুলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলে ইশারায় বলেন অপেক্ষা করতে। আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিই। মিঃ ব্রাউনকে ধন্যবাদ, কাজের মধ্যে আমার কথা মনে রেখেছেন।

মেল-বয় বাক্স নিয়ে চলে গেল। বাবুরা সিট ছেড়ে অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কখন টিফিনের টাইম হয়ে গেছে, প্রায় শেষ হয়ে আসতে চলল।

এতক্ষণে সময় হল মিঃ ব্রাউনের। কিছু ফুলস্ক্যাপ কাগজ, একটি পেন্সিল এবং কয়েকটি অঙ্কের একটি প্রশ্নপত্র আমায় দিয়ে বললেন—Try to work out these sums. I shall come after one hour to see these completed. (এই অঙ্কগুলো করুন ; এক-ঘণ্টা পরে এসে যেন দেখতে পাই হয়ে গেছে এগুলো)

তারপর মিঃ ব্রাউন শিষ দিতে দিতে লাঞ্চ সারতে গেলেন।

সেই অভুক্ত অবস্থায় উদ্গত অশ্রু প্রাণপণে রোধ করতে করতে পরীক্ষা দিতে বসলাম। মোট আটখানা অঙ্ক কষতে হবে। সময় একঘণ্টা। সাতটা সাধারণ বুদ্ধির অঙ্ক। ঘণ্টা হিসেবে মজুরী এবং মাগ্‌গীভাতা বার করা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কনট্রিবিউসনের হিসাব করা, অয়েল বিলের পেমেণ্ট এবং ডিসকাউণ্টের হিসেব করা জাতীয় অঙ্ক। একটা মাত্র বুক কিপিংয়ের। ট্রায়াল ব্যালান্স থেকে ট্রেডিং, প্রফিট এণ্ড লস এবং ব্যালান্স-শীট মেলানো।

এক ঘণ্টার কিছু পরেই এলেন মিঃ ব্রাউন। ইতিমধ্যে আমার সব অঙ্ক

কথা হয়ে গেছে। অধীর হৃদয়ে তাঁর ফেরার অপেক্ষা করছি। বাবুরা ক্যান্টিন থেকে আহার সেরে ঢেকুর তুলতে তুলতে এসে যে যাঁর আসনে বসলেন। আমার মনে হল, আর তেমন পেটের জ্বালা বোধ হচ্ছে না। ক্ষিধে মরে গেছে বলেই হয়ত।

মিঃ ব্রাউন এসে কাগজপত্র নিলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জির ঘরে। হরুদার সেই আত্মীয় যিনি। সৌম্যমূর্তি, দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর ছেলের বয়েসী এক অফিসারকে ঢুকতে দেখে। চেয়ার ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়ালেন। মিঃ ব্রাউন গিয়ে বসলেন তাঁর চেয়ারে। আমার উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে লাগলেন। সঠিক অঙ্কগুলো টিক মারতে মারতে একটা ভুল পেয়ে গর্জন করে ওঠেন—Just see chatterjee, he is a B. Com. at Calcutta University. Really a shame! (চ্যাটার্জি দেখুন, এ কলকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের একটা গ্রাজুয়েট—লজ্জার কথা! একটিই ভুল হয়েছিল তার জন্যে ঐ রূঢ় মন্তব্য।

মিঃ চ্যাটার্জি পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। মিঃ ব্রাউন তাঁকে হুকুম করলেন—Give him an appointment form to fill in. (একে একটা ভর্তির ফরম দিন) তারপরই হঠাৎ কি মনে হওয়াতে জিজ্ঞাসা করলেন—Do you know this gentleman? (আপনি কি এই ভদ্রলোকটিকে চেনেন?)

মিঃ চ্যাটার্জি ইতিপূর্বে দু' একবার আমায় দেখে থাকলেও থাকতে পারেন। মফঃস্বলের এই আধা শহরে মাতৃ-কুল সম্পর্কে আমার বাল্যাবধি বসবাস। জন্ম যদিও বর্ধমান জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে এবং সেখানের মাঠে ঘাটে যদৃচ্ছ বেড়িয়ে আমার শৈশব অতিবাহিত, তবু বলতে গেলে আমি এই আধা শহরেই মানুষ। এখানেই মাতুলালয়ে আমার শিক্ষা-দীক্ষা। প্রবেশিকা পাশ করে সত্তর টাকা কেরাণীর জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মামা-মামীমার ইচ্ছাতেই মাতুলালয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের অন্নজলের সম্পর্ক চুকে গেছে। মিঃ চ্যাটার্জী

যদিও এখানের বাসিন্দা নন, আরও ইন্‌টিরিয়রে এক ঘুঘু-ডাকা, ছায়া-ঢাকা গ্রামে তাঁর বাস, তথাপি এই আধা-শহরের বুকের ওপর দিয়েই তাঁকে নিত্য যাতায়াত করতে হয় অফিসে, বাজারে। অতএব আমাকে দেখেও থাকতে পারেন। তাছাড়া আমার কথা হরুদা আগেই বলেছেন তাঁকে। নিশ্চয় পরিচয় দিয়েছেন অমুকের ভাগ্নে ব'লে। হয়ত নিশাদির কাছে দেওয়া সেই কমপ্লিমেণ্টটার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, হীরের টুকরো ছেলে।

হয়ত সেই কারণেই তিনি মিঃ ব্রাউনের প্রশ্নের জবাব দিলেন—Yes, I know him. (হ্যাঁ, চিনি।)

মিঃ ব্রাউনকে ভয়ানক ধূর্ত বলে মনে হয় তাঁর পরবর্তী প্রশ্নে—What is his name? (এঁর নাম কি?)

এর উত্তর দেওয়া মিঃ চ্যাটার্জির পক্ষে সম্ভব ছিল না আমি জানতাম। আমিই সুবিধা সুযোগ অন্বেষী সেণ্টার ফরোয়ার্ডের গোল করার মত দ্রুত জবাব দিলাম—সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিঃ ব্রাউন শিশুর কথাবলার চেষ্টা করার মত আমার সারনেমটা বার কয়েক উচ্চারণ করতে গিয়ে এই পর্যন্ত সফলকাম হলেন—বন্‌ডোপাঢায়া।

এবং ঐ নামটা জপ করতে করতে আমাদের দুজনকেই বিস্মিত করে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ চ্যাটার্জি আসন গ্রহণ করলেন। একখানা তিনপাতা ছাপানো এ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট ফর্‌ম আমার হাতে দিয়ে বললেন—যাও, ফর্‌মটা ভর্তি করে নিয়ে এস।

ভিজিটারদের টেবিলে ফিরে এসে ফর্‌মখানা পূরণ করলাম সতর্কতার সঙ্গে। পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখলাম স্কুলটিচার। কেরাণীর বদলে এটা উল্লেখ করা গৌরবজনক ব'লে আমার কেন মনে হয়েছিল, জানি না। পরে যখন কলেজে পড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন এ মোহ ঘুচেছিল। সে কথা এখন থাক।

সেদিনটা ছিল ১৫ই মার্চ উনিশশো একান্নো সাল। সোমবার। ফর্ম ভর্ত্তি করে মিঃ চ্যাটার্জীর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে মিঃ ব্রাউনের ঘরে। জিজ্ঞাসা করলেন—মিঃ ব্রাউন, উইল হি জয়েন ফ্রম টোমরো? (মিঃ ব্রাউন, এ কি কাল থেকে কাজে আসবে?)

মিঃ ব্রাউন ফর্মটার ওপর বার কয়েক চোখ বুলিয়ে লিখে দিলেন—Report on first April. (১লা এপ্রিলে আসুক)

আমি অভুক্ত অবস্থায়, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে কারখানা থেকে বেরিয়ে এলাম দুর্বোধ্য এক অনুভূতি নিয়ে। আমি জানতেই পারলাম না, আমার চাকরীটা হল কি হল না।

গেটের সেই দারোয়ানটা সেলাম জানিয়ে জিগ্যেস করল—কাম হুয়া বাবু?

তার সঠিক জবাব আমার জানা ছিল না ব'লে ম্লান হাসি দিয়ে নিজেকে তার কাছে দুর্বোধ্য করে তুলতে চেষ্টা করলাম।

৩

পরদিন ছবি এল হেডমাষ্টারমশায়ের কাছে। ছবি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। সে সম্বন্ধে কি করণীয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছে।

ছবি সোজা হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে ঢুকে গেল। যা জানবার, জেনে নিয়ে চলে গেল কিছুক্ষণ পরে। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

ছবি চলে যেতেই মনে পড়ল, আমাকে এক্ষুণি একখানা পদত্যাগপত্র টাইপ করতে হবে। মাঝে পনের দিন মাত্র সময়। নিয়মমাফিক পনের দিনের নোটিশ দিয়ে আমাকে এ চাকরী ছাড়তে হবে।

পদত্যাগ পত্রখানা টাইপ করে ফেললাম। সই করতে গিয়ে একটু

হাতটা কেঁপে উঠল। ছাড়ছি বটে, ওটা যদি ফসকে যায় তাহ'লে কি হবে?

পত্রখানা নিয়ে চোখ বোলালেন রবিনবাবু। ম্লান হাস্যে বললেন—আমাদের ছেড়ে চললেন তাহ'লে?

সহকারী শিক্ষক কৃতান্তবাবু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন—আমি আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, যদি শুনতেন, তাহ'লে সত্যবাবু আমাদের ছেড়ে কখনোই যেতেন না। সামান্য একজন কেরাণী হয়ে কেন উনি এখানে পড়ে থাকবেন? যদি ওঁকে টিচার-কাম ক্লার্ক করে নিতেন, তাহ'লে সাপও মরত, লাঠিও ভাঙত না।

রবিনবাবু বললেন—আমার ইচ্ছায় তো এটা করা সম্ভব নয় মশাই? এসব ব্যাপারের মীমাংসা হওয়াটা ম্যানেজিং কমিটির ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে।

কৃতান্তবাবু বললেন—মানলাম আপনার কথা। কিন্তু কমিটির কাছে বিষয়টা আলোচনার জন্যে তো আপনাকেই রাখতে হবে।

রবিনবাবু বললেন—আমি সাউণ্ড করেছিলাম, ওঁরা কেউ রাজী হন নি।

কৃতান্তবাবু ক্লাসে যাবার জন্যে উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বললেন—কিছু কিছু কাজ নিজের ইনফ্লুয়েন্সে হাসিল করতে হয়। যাক্—গতস্য শোচনা নাস্তি।

কৃতান্তবাবু চলে যাবার পর রবিনবাবু চিঠিখানা আমাকে ফেরৎ দিয়ে বললেন—আপনি এখানা নিজে সেক্রেটারী মশায়ের হাতে গিয়ে দিলে ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন, নইলে কে আবার মাঝখান থেকে ব্যাগড়া দেয় কে জানে। আপনার সব কাজকর্ম কিন্তু আপ-টু-ডেট করে যাবেন। সাব এ্যাকাউন্টের খাতাগুলোয় পোষ্টিংএর কাজ বাকী পড়ে নেই তো?

মাথা চুলকে উত্তর দিই—কিছু এরিয়ার আছে। যাবার আগে সমস্ত আপ-টু-ডেট করে দিয়ে যাব।

স্কুলের ছুটির পর গেলাম সেক্রেটারীর বাড়ী। জমিদারতুল্য লোক তিনি। কংগ্রেসসেবী। জীবনে কোনদিন চাকরী করতে হয় নি তাঁকে। অধুনা সরকারী হেফাজতে উদ্বাস্তুদের জমি বিক্রয় করে প্রভূত অর্থ হাতে পেয়েছেন। লোক হিসেবে খুবই ভাল। তবে তাবৎ ধনীলোক-দের মতই তোষামোদ প্রিয়। তিনি ব্রাহ্মণ এবং আমার স্বগোত্র। স্কুলের কাজে যখনই এসেছি, তখন বাড়ীতে আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হয় নি।

জীবনবাবুর মেয়ের মুখে শুনলাম তিনি তখনো ওপর থেকে নামেন নি। গৌরী খাতির করে বৈঠকখানায় বসাল। সেকেলে বিরাট অট্টালিকা বাড়ী। দেওয়াল থেকে চুনবালি খসে পড়েছে। ফাট ধরেছে কোথাও। বৈঠকখানার দেওয়ালে বিরাট একখানা খাঁড়া ঝুলছে।

আমাকে বসিয়ে গৌরী চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল সে। হাতে বাটিতে করে কিছু মুড়ি এবং নারকেল নাড়ু। বলল—খান, সোজা স্কুল থেকে এসেছেন, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। বাবাকে খবর দিয়ে চা নিয়ে আসছি, কেমন ?

বললাম—আচ্ছা।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় চা নিয়ে এল গৌরী। বলল—চাটা খেয়ে নিন। বাবা আপনাকে ওপরে গিয়েই দেখা করতে বলেছেন।

তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে গৌরীর পেছনে পেছনে ওপরে উঠে গেলাম। যেতে যেতে মনে হল, গৌরীর মত মেয়ে বুঝি হয় না। হৃদয় তার স্নেহে ভরা। সে যেন মায়ের মতন। মা সব ছেলেকেই সমান স্নেহ দান করেন। গৌরীও মানুষকে নির্বিচারে স্নেহ করে। তার কাছে একটা সত্তর টাকা মাইনের কেরাণীও অযাচিত স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়।

জীবনবাবু খাটের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থাতেই আহ্বান জানালেন—আরে সত্য, এসো এসো। কি খবর ? কিছু সই টই করতে হবে নাকি ?

আমি বিনীত ভাবে বললাম—আঁজ্ঞে না, আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছি। স্কুলের কাজে আসি নি।

—কি ব্যাপার? বল শুনি—

—অ্যাঁজ্ঞে—আমি একটা চাকরী পাচ্ছি, তাই—

—চাকরী? কোথায় পেলে?

—বনস্পতি কারখানায়।

—মধুবাবু করে দিলেন বুঝি?

—হরুদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, মিঃ চ্যাটার্জি রেকমেণ্ড করে দিয়েছেন।

—জয়েন করেছ?

—না, কাল ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছি। পয়লা এপ্রিল থেকে জয়েন করতে হবে। আমি রেজিগ্‌নেশান পত্রখানা হাতে দিতে এসেছি। আমাকে দয়া করে স্পেয়ার করুন।

শুনে জীবনবাবু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—লোকে যতই আমাকে মন্দ বলুক, আমি কিন্তু কারও উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না। আমি জানি, তুমি চলে গেলে একজন নয়, দুজন ক্লার্কের দরকার হবে স্কুলে, কিন্তু তবু তোমার অনিষ্ট হ'ক, এটা আমি চাই না। প্রার্থনা করি, তোমার উন্নতি হোক। নিজের পায়ে দাঁড়াও, দেশের, দশের সেবা কর। দাও দেখি চিঠিখানা। হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমি তোমাকে স্পেয়ার করলাম। আর এটাও বলি, শুনে যাও—ছাড়তে একটু কষ্টও হচ্ছে। তবু তোমার মঙ্গলের জন্যে এই কষ্টটুকু স্বীকার করলাম।

জীবনবাবুর কথায় অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার মামার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। মামা ভাল গাইয়ে। জীবনবাবু গান বাজনায় ওস্তাদ। গোল্ল গাল, বেঁটে খাটো চেহারা। থিয়েটারে যখন স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তখন তাঁকে পুরুষ বলে চেনাই যেত না। গলাটিও ছিল মিষ্টি।

ম্যাট্রিক পাশের পর মামার সুবাদেই স্কুলের চাকরীটা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। আজ পাঁচ বছর ধ'রেই দেখছি, জীবনবাবুই সেক্রেটারী। জীবনবাবু যে আমার পদত্যাগ পত্রখানা দুঃখিত মনেই গ্রহণ করলেন, তাঁর কথাগুলি যে আন্তরিক, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ রইল না। আমি নতুন করে আমার প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় পেলাম। প্রণাম করলাম তাঁর পা স্পর্শ ক'রে তারপর অনুমতি নিয়ে চলে এলাম।

নীচে সিঁড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল গৌরী। কৌতুক কণ্ঠে বলল—আমি সব কথা শুনেছি সত্যদা।

সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলাম—কি শুনেছ?

—ভাল চাকরী হয়েছে আপনার। শুনে খুব খুশী হয়েছি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। অপরের উন্নতির কথা শুনলে কার না আনন্দ হয়?

গৌরীর মনের বিশ্বাসকে নষ্ট ক'রে দিতে ইচ্ছে হ'ল না। ওর মন পবিত্র। হৃদয়ে অফুরন্ত স্নেহ। মানুষের উন্নতি দেখে প্রায় সব ক্ষেত্রেই যে মানুষের আনন্দের বদলে ঈর্ষা হয়, গৌরীর মত দু'একজন তার ব্যতিক্রম থাকে।

বললাম—গৌরী, এখন চলি, কেমন?

প্রসন্নমুখে গৌরী বলল—আচ্ছা, আসুন।

পনেরটা দিন দারুণ এক দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল। এইভাবেই স্কুলের কাজ ক'রে যাই। অসিতদার ষ্টুডিওতে গিয়ে বসি। বাসায় ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই দুর্ভাবনা বেশী ক'রে চেপে বসে। আকাশ-পাতাল কত কী ভাবি। মনের মধ্যে দারুণ অস্বস্তি পুষে ভাল ক'রে ঘুমুতেও পারি না।

মিঃ ব্রাউনের মনে থাকবে তো আমার কথা? যদি আমার চেয়েও ভালো ক্যানডিডেট্ পান, যে সব অঙ্কগুলোই ঠিক ঠিক ক'রে ফেলবে, একটাও ভুল হবে না—কথাবার্তা, বেশভূষা, চেহারা এবং আদব কায়দায়

আমার চেয়ে স্মার্ট, তা'হলে? মিঃ ব্রাউন যদি তাঁকে নিয়ে নেন? পয়লা এপ্রিলে গেলে তিনি যদি আমাকে এপ্রিল ফুল করেন তাহ'লে?

দুশ্চিন্তায় প্রায়ই রাত্রে স্বপ্ন দেখি। আমার এ কুল গেছে, ও কুলও গেছে। মাঝ-দরিয়ায় যেন হাবুডুবু খাচ্ছি। দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। ঘুম ভেঙ্গে দেখি, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। মনে পড়ে, আমি যেন স্বপ্নে এক অসহ্য বেদনায় কাঁদছিলাম; হাত দিয়ে দেখি, চোখের পাতা ভিজে ভিজে।

আর এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি হাবুডুবু খাচ্ছি মাঝ-দরিয়ায়। একটা পানসে নৌকো যাচ্ছিল পাশা দিয়ে। নৌকোয় ব'সে গৌরী আর জীবনবাবু। আমায় দেখে গৌরী চীৎকার ক'রে বাবাকে ব'লে উঠল—বাবা, ঐ যে সত্যদা জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন, ওঁকে তোলো—নৌকো থামাতে বল মাঝিকে—উনি মারা যাবেন যে—

জীবনবাবু অট্টহাস্য ক'রে বললেন—মরুক, তোরই বা কী, আমারই বা কী?

পান্‌সে নৌকোখানা তীর গতিতে ছুটে চলে গেল। গৌরীর কান্না মিলিয়ে গেল এক সময়। আমি জেগে বুঝতে পারি, স্বপ্ন! কিন্তু সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ভাবনা হয়, ওখানে যদি চাকরী না পাই, কি হবে তাহ'লে? জীবনবাবুর কাছেই যেতে হবে নাকি আবার? গৌরী শুনে হয়ত বিদ্রূপের হাসি হাসবে। জীবনবাবু হয়ত বলবেন—লোক ঠিক হয়ে গেছে সত্য, এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। তখন কোথায় যাব আমি?

অসিতদাকে দুশ্চিন্তার কথা খুলে বলি। শোনামাত্র উনি যেন লাফ দিয়ে ওঠেন—সত্য, তুমি না পুরুষ মানুষ? সামান্য ব্যাপারে এত দুশ্চিন্তা কিসের শুনি? আমাদের মত ফ্যামিলি-ম্যান তো নও যে এত আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে। একটা পেটের জন্যে তোমার

এত ভাবনা ? ছি ছিঃ, এটা তোমার কাছে আশা করি নি। এত দুর্বল তুমি ? মনটাকে শক্ত করো। সবার আগে চাই পুরুষকার। কে বলেছে তোমার কাজ হবে না ? আলবাৎ হবে। যদি নাই হয় তো হয়েছে কি ? এই অসিত রায় থাকতে তোমাকে উপোষ ক'রে থাকতে হবে না বুঝলে ?

অসিতদার কথায় সান্ত্বনা পাই। মনে বল পাই অনেকখানি।

এমনি করেই একদিন পয়লা এপ্রিলের প্রভাত এসে উপস্থিত।

আমার জানা তাবৎ দেবদেবীকে স্মরণ ক'রে গেলাম কারখানায়। সোজা মিঃ ব্রাউনের ঘরে গিয়ে সুপ্রভাত জানালাম।

মিঃ ব্রাউন প্রত্যুত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—You are Bondopadhyaya, eh ? come on. (তুমিই বন্ডোপাঢায়া তো ? এস) বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ ব্রাউন সোজা গেলেন টাইম-অফিসে। হেড টাইমকীপার মিঃ চাচাকে বললেন—হিয়ার ইজ বন্ডোপাঢায়, এ্যাপোয়েণ্টেড্ ফ্রম টু-ডে অ্যাজ টাইম-কীপার—ও কে ? এই হল বনডোপাধ্যায়, আজ থেকে টাইম কীপার হিসেবে নিযুক্ত হল, ঠিক আছে ?

তারপর আমার দিকে ফিরে পরিচয় দিলেন—মিঃ চাচা,হেড টাইম-কীপার।

আমি হাত তুলে নমস্কার জানালাম মিঃ চাচাকে। তিনিও সহাস্যে ঘাড় নেড়ে সেটা গ্রহণ করলেন।

মিঃ ব্রাউন মিঃ চাচাকে পুনরায় বললেন—Instruct him Mr. Chacha, and put him in any shift as you like. Now you have got four people—Mr. Ganguly, Mr. Mukherjee Mr. Chakrabarty andthis Bandopadhyaya. Don't disturbe me any more. Look Mr. Chacha, hence forth work must run smoothly—that is what about which I am interested—understand ? (মিঃ

চাচা, একে কাজকর্ম শিখিয়ে নাও, যে শিফটে তোমার খুশী একে আসতে বল। এখন তুমি চারজন লোক পেলে—মিঃ গাঙ্গুলি, মিঃ মুখার্জী, মিঃ চক্রবর্তী আর এই বন্‌ডোপাঢায়া। আর আমাকে বিরক্ত করো না। এখন থেকে কাজ ভাল রকম করা চাই কিন্তু, এটাই আমি দেখতে চাই বুঝেছ ?)

মিঃ চাচা তাঁর হিটলারী গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন—Yes Sir, now everything is allright. (হ্যাঁ, এবার সব ঠিক আছে)

মিঃ ব্রাউন শিষ দিতে দিতে সার্জারী ঘুরে অফিসের দিকে চলে গেলেন।

মিঃ চাচা পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বললেন—বসুন মশায় !

আমি জিগ্যেস করলাম—মিঃ গাঙ্গুলি কোথায় গেছেন ?

—এই ডিপার্টমেণ্ট থেকে ওয়ার্কশীট চাইতে গেলেন একটু আগে। এই এক ঝামেলা মশায়। ঘুরে ঘুরে ওয়ার্কশীট চেয়ে আনতে হবে, কেউ দিয়ে যাবারই নাম করে না।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না ওয়ার্কশীট আবার কি বস্তু ? আমি বোকার মত প্রশ্ন করলাম—ওয়ার্কশীট কি জিনিস ?

—ওটা কে কোন্ ডিপার্টমেণ্টে, কোন লোকেসানে কতক্ষণ কাজ করে তার হিসেব। সেই দেখে টাইম কার্ডের ঘণ্টা মেলাতে হয়। আপনি বসুন, কাজ সবই বুঝিয়ে দিচ্ছি। অত তাড়া কিসের ?

আমি লজ্জিত হলাম—না, সে জন্যে জিগ্যেস করি নি।

—গাঙ্গুলি আপনার রিলেটিভ হয় নাকি ?

—না, এমনি চেনা জানা আছে।

—ভাল করে কাজ বুঝে নেবেন মশায়। তাড়াহুড়ো কিছু নেই। দুটো দিন গাঙ্গুলির কাছ থেকে কাজকর্ম্ম বুঝে নিন। তারপর শিফ্‌টে পাঠাব আপনাকে।

—আচ্ছা।

এইভাবে মিঃ চাচার অধীনে টাইম-কীপার হিসেবে পয়লা এপ্রিল থেকে কাজে বহাল হলাম। আমার জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিন হ'লো এইটি। এই তারিখেই কয়েক বছর পরে আমি বিল সেকসনে বদলি হয়েছিলাম। সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা ডিউটির বদলে ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটির কমার্শিয়াল ষ্টাফে পরিণত হয়েছি, সেও এই দিনটিতেই। সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

৪

মানুষের সমাজে যিনি আইনের প্রবর্তা, তাঁর নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত অপরাধীকে সাজা দেওয়া। কালে আইনরূপী মহীরুহের ডাল-পালা যতই বিস্তৃত হয়েছে, জটিলতা বেড়েছে ততোধিক। সেই জট খুলতে গেলে দেখা যাবে, আসল দোষী আইনের চোখে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে আর নিরীহ ব্যক্তির শিরে ঝুলেছে আইনের খড়্গ।

সবচেয়ে মজার কথা হল, যাঁরা আইন প্রণয়ণ করেন, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান তাঁরা নিজেরাই। একই অপরাধে নিজেকে ক্ষমা করেন, অপরকে দেন সাজা।

মিঃ ব্রাউনের অন্ততঃ বেণীলালকে কারখানার মধ্যে নারী-ঘটিত ব্যাপারে জড়িত হওয়ার অপরাধে বরখাস্ত করা উচিত হয় নি। এ ব্যাপারে তিনিও নির্দোষী ছিলেন না।

বংশী দারোয়ান ছিল বেণীর বন্ধু। সব ব্যাপারটা সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছে। কোম্পানীর কাছে সব কথা ফাঁস করেছে সেই। জেরার ঠেলায়, নিজের চাকরীর ভয়ে সব কথা বলতে তাকে একরকম বাধ্য করা হয়েছে।

বেণীলাল তাগড়াই জোয়ান আদমি। দারোয়ান কোয়ার্টারের পাশে

আখড়া তৈরী করেছিল সে। নিয়মিত কুস্তি করত। চেহারাটার বাঁধুনি ছিল চমৎকার। ব্যবহারে ছিল খানিকটা বেপরোয়া ভাব। জমাদার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি দারোয়ান বাবুদের 'রাম রাম' করত ; বেণীলাল ওসবের ধার ধারত না।

কারখানার মধ্যেই দারোয়ানদের কোয়ার্টার। ফ্যামিলি নিয়ে থাকবার নিয়ম নেই। ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে হলে বাইরে নিজেদের খরচায় ঘর ভাড়া করে থাকতে হবে।

প্রায় সব দারোয়ানই (দুজন ড্রাইভারও) কোয়ার্টারে থাকত একা একা। শুধু নেপালী দারোয়ান হরিবাহাদুর প্রথমা স্ত্রীকে ছেড়ে অল্প-বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনে বাইরে থাকত, আর থাকত সপরিবারে কুদরাৎ হোসেন।

বেণীলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বনোয়ারীলাল কাজ করত পাশের এক কার-খানায়। সস্ত্রীক সে বাস করত কাছেই একটা খোলার ঘর ভাড়া করে। বেণীলাল প্রায়ই যেত সেখানে। বংশীকেও নিয়ে যেত। চার-জনে তাস খেলত, সিনেমা দেখত, কখনো বা হৈ হুল্লোড় করত ভাঙ খেয়ে।

বনোয়ারীলালের স্ত্রীর নাম ললিতা ওরফে লাল্‌তা। লাল্‌তার বয়স কুড়ি-একুশের বেশী নয়। সত্যিই সুন্দরী। গড়নটা ইস্পাতের মত। বংশী তার ভাষায় আমাকে বলেছিল, এমন ক্ষীণকটি নারী সচরাচর দেখা যায় না। এমন উচ্ছল প্রকৃতির মেয়েও খুব কম দেখা যায়।

লাল্‌তা সত্যই মনোরমা। হাসলে টোল খায় তার গালে। কুন্দ শুভ্র দন্তপাতির কিছু অংশ দেখা যায়। বেণী সেই মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। বংশী ঠেলা দিলে হুঁস হত তার।

এটা লক্ষ্য করে বংশী কতবার তাকে বলেছে—বেণী ভাই, বনোয়ারীকে খুব খপসুরৎ জেনানা মিল গেইল। হাম সমঝলিও, তুমহারা দিমাক খারাপ হো গেইল। তুম উন্‌কো সাথ প্যার করনে মাংতা।

বেণী জবাব দিয়েছে—লাল্‌তা মেরা রাধা হ্যায় বংশী, মেরা দিল তুমহারা মাফিক 'রাধা রাধা' বোল রাহা হ্যায়।

বংশী চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করে—হামারা মাফিক ?

—তুমহারা মাফিক নেহি, তুমহারা নামকা মাফিক, কিষাণজীকা বংশী কেয়া বোলতা হ্যায়, তুম নেহি জান্‌তে হো ?

—এহি বাৎ বোলো! লেকিন, বেণী ভাই, হাম এ চিজ্‌ পছন্দ নেহি কর্‌তা। ছোড়ো এইসা কাম!

—নেহি, নেহি, তু মুঝে কৃপা কর বংশী। কুছ মাৎ বোল বনোয়ারী-কো। এইসা চলনে দো। নেহি তো ম্যায় জিন্দা রহনে নেহি সেকতা।

—ঠিক হ্যায়। হাম আউর কুছ নেই বোলে গা। লেকিন, কুছ গড়বড় হো যায়, তব ?

—কেয়া গড়বড় হোই ? আয়ান ঘোষ হ্যায়ই হ্যায়—ডর কেয়া রে ? তুম নেই সমঝতে হো কি, লাল্‌তা মেরে জীবন হ্যায়।

—দোস্তকা সাথ দুষমণী করনা ঠিক নেহি হ্যায় বেণী ভাই!

—মহব্বৎ দুষমণী না মানে বংশী।

—শোচ, ঘরমে তুমহারা জেনানা এইসা দুষমণি করে, তব ক্যা হই ?

—এই সা দুখ মাৎ দে বংশী ভাই। উস্‌কো মর্‌জি হোগা তো ম্যায় রোখ সেকে ?

—ঠিক হ্যায়। করো, তুমহারা যো খুশী।

বংশীর মুখে শুনেছি এ সব কথা। বন্ধু পত্নী লাল্‌তার সঙ্গে মহব্বৎ হয়েছিল বেণীলালের। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এ প্রেম। বংশী গোড়ায় টের পায় নি। বনোয়ারী সন্দেহ করে নি কোনদিন। পরে চোখে পড়েছিল বংশীর। সাবধান করে দিয়েছিল বেণীকে। বেণী তার কাছে সব কথা খুলে বলেছিল। লাল্‌তা স্বামীকে ভালবাসে ঠিকই। তাকে মন দিয়েছে, দেহ দিয়েছে। তবু তার মনে দ্বিতীয় পুরুষের প্রেম রেখাপাত করেছে। স্বামীর উচ্ছিষ্ট দেহটাই শুধু দিতে বাকী রেখেছে তার প্রেমিককে।

বংশীর কাছে সব কথা বলেছিল বেণী। তার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করেছে সে। সে তখন উন্মত্ত। বংশীর নিষেধ সে শোনে নি।

প্রথম প্রথম ছিল শুধুই ছ'চোখ ভরে রূপ সুধা পান। এক একটি করে পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে আরতি। প্রথমে শুধুই চোখ দিয়ে দেখা; তারপর একে একে এগিয়েছে বেণী। লাল্‌তার মনের নাগাল পেতে চেয়েছে; রূপের সৌরভে মাতাল হয়ে হাত বাড়িয়েছে তার দিকে। হাতে হাত রেখেছে লাল্‌তা, স্পর্শ করতে চেয়েছে, ধরা দিয়েছে বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে! আকুল তৃষ্ণায় বেণী যখন অধর স্পর্শ করতে চেয়েছে, তখনো বাধা দেয় নি সে। কোনমতেই বেণী আর এগুতে পারে নি। লাল্‌তার দৃঢ়তার কাছে বার বার মাথা হেঁট করে চলে এসেছে।

বেণী যতটুকু পেয়েছে, তাতেই তৃপ্ত হতে চেষ্টা করেছে। বুঝতে পেরেছে, প্রেমের প্রতিমাকে এইভাবে জীবন্ত করে তোলা যায়। কোথায় থামতে হবে, সেকথা প্রেমিকের জানা উচিত। ত্রুটিপূর্ণ আরতিতে প্রেম হয় কলুষিত। কেবলমাত্র দেহকে কুরে কুরে খাওয়ার বিকারে পর্যবসিত হয়ে অপমৃত্যু ঘটে প্রেমের। এসব কথা লাল্‌তাই বুঝিয়েছে তাকে।

বেণী বুঝেছিল কথাটা। হিংস্র শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবৃত্তিটা দমন করতে চেষ্টা করত সে।

লাল্‌তা বেণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল কতকটা বনোয়ারীর দোষে। বনোয়ারীর সঞ্চয়ের নেশা ছিল এমন, যে স্ত্রীর সামান্য সাধ-আহ্লাদ মেটানোর দিকে নজরই দিত না।

বেণীর মন ছিল উদার; এসব ব্যাপারে মুক্তহস্ত। বন্ধুপত্নীর ছোট খাট সাধ-আহ্লাদ মেটানোর ভার সে সানন্দে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছিল। তাকে সিনেমা দেখাত, রথের মেলায় নিয়ে যেত সার্কাস দেখাতে। সঞ্চয়ী বনোয়ারী এতে বাধা দিত না।

স্ত্রীকে। বরঞ্চ খুশীই হত। পরের পয়সায় স্ত্রীর সিনেমা দেখা হচ্ছে, মাঝে মাঝে স্নো-পাউডার আসছে, মন্দ কী! তার তো পয়সা জমছে পোস্টঅফিসে। তার একমাত্র স্বপ্ন দেশে কয়েক বিঘে জমি-জিরেত কেনা। অবস্থা বেণীর মত স্বচ্ছল নয় তার।

মাঝে মাঝে সেও যেত। বেণীর পয়সায় সস্ত্রীক সিনেমা-সার্কাস দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করত বনোয়ারী। মনে মনে হাসত বেণীর বোকামীর জন্যে। স্ত্রীর সামনে তাকে উপহাস করতেও ছাড়ত না। লাল্‌তা এতে কপট রাগের ভান করত, আর হাসত বেণীলাল। বনোয়ারী সেটা খুবই উপভোগ করত।

লাল্‌তা-বেণীর পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্র ছিল মোটামুটি উর্বর। তাতে ওরা চুটিয়ে ফসল তোলার নেশায় মশগুল হয়ে উঠল।

প্রেম চির অভিশপ্ত। মানুষের মনকে সোনা করে সত্য, কিন্তু তার পরমায়ু অতি অল্প। সোনা-মন হারিয়ে যায়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

লাল্‌তা-বেণীর পরকীয়া প্রেমের আদি, মধ্য তাবৎ প্রেমিক-প্রেমিকার মতই হুবহু এক। শুধু অন্ত্যেই একটু যা নতুনত্ব ছিল। সেটাই ঘটেছে কারখানার ভেতরে।

কারখানার নিয়ম অমান্য করে বেণী তার হৃদয়ের অধীশ্বরীকে নিজের ডেরায় এনেছিল একদিন-কা-সুলতান হবার লোভে। সভ্য সমাজের চোখে সেটাই হল মস্ত বড় অপরাধ। যদিচ সভ্য সমাজ লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই অপরাধই করে বেড়াচ্ছে।

বংশীর মুখেই শুনলাম সে রাত্রির ঘটনা। বনোয়ারীর ছিল ডবল ডিউটি। বেলা তিনটে থেকে পরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত।

বংশীকে টেনে নিয়ে বেণী গিয়েছিল লাল্‌তার কাছে। তিনজনে পেস্তা বাদাম মিশিয়ে ভাঙ খেল। মোহিনীবেশে সেজে লাল্‌তা তাদের সঙ্গে গেল সিনেমায়। নাইটশোতে।

এগারোটা নাগাদ ফিরছিল তারা। বেণী তার মাতৃভাষায় জিজ্ঞাসা করল—বনোয়ারীর তো ডবল ডিউটি। একা একা ঘরে শুয়ে থাকতে ডর লাগে না ?

লাল্‌তা মিষ্টি হেসে জবাব দিল—লাগলেই বা উপায় কি ?

বেণীর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি ভর করল। বলল—আও মেরা ডেরামে—

লাল্‌তা অবাক হয়ে বলল—আ—চ্ছা ! উস্‌কে বাদ ?

—সবেরে সবেরে তুম ওয়াপস চলি আয়েগী।

—তুম পাগল হো গেইল না কেয়া ?

—নেহি, নেহি লাল্‌তা। চলো মেরা সাথ। চলো মেরা ডেরামে—বহুৎ রোজসে এহি মেরা ধেয়ান হ্যায় লাল্‌তা--

বংশী বলেছিল—বেণী ভাই, বাচ্চিৎ মাৎ করো এইসা। বহুৎ ভাঙ পিয়ে হ্যায় তুম।

তারপর বলেছিল লাল্‌তাকে—চলো বহিন, ঘর চলো।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে লাল্‌তা বলল—লেকিন, উও কেয়া বাতাতা হ্যায় শুন্‌তা নেহি ?

রেগে গিয়ে বংশী বলল—শুন্‌তা তো হ্যায়, তো চলো উসকো ডেরা 'পর। হামারা কেয়া ?

লাল্‌তার বোধহয় নেশা ধরেছিল। ভাঙের নেশায় দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। ভরা পুকুরে কল্‌মীশাকের দামকে বিছানা ভেবে শুতে গেছে, এমন ভাঙখোর আমার চাক্ষুষ দেখা।

মিষ্টি হেসে বলল—ম্যায় যাউঙ্গী।

বংশীর বুক কেঁপেছিল। পরিণাম এতটা খারাপ হবে, সেটা অবশ্য সে আন্দাজ করতে পারে নি।

পারলেই কী সে থামাতে পারত বেণীকে ? বেণী তখন পাগল ; আশ্চর্য, লাল্‌তাও কেমন মত দিয়ে বসল ওর অসম্ভব ইচ্ছে পূরণ করতে। এমন সাহসিনী অভিসারিকার কথা বংশী নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করতে পারত না। তার মনে হল, লাল্‌তা অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের

মেয়ে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে চলেছে উপপতির সঙ্গে নৈশ-অভিসারে।

কেন চলেছে লাল্‌তা? কি তার উদ্দেশ্য? এর পেছনে লুকিয়ে আছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য; বংশীর কাছে তা স্পষ্ট বলেই মনে হয়। এটা লাল্‌তার বিকৃত যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু নয়। একজন পুরুষের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?

গেটে কর্মরত দারোয়ান বাধা দিয়েছিল তাদের। তাদেরই সহকর্মী। তাকে বোঝাতে বেগ পেতে হয় নি।

বেণী বলেছিল—দেশ থেকে আত্মীয় এসে পড়েছে হঠাৎ, একটা রাত্রির আশ্রয় মাত্র; কালই সে অন্য জায়গায় কাজ করে রেখে আসবে। কাক, পক্ষী জাগার আগে চলে যাবে আত্মীয়াকে নিয়ে।

বেণীর কথায় বিশ্বাস করে দারোয়ান তাদের যেতে দিয়েছিল।

তারপর সোজা নিজেদের কোয়ার্টারে।

তখন মধ্যরাত্রি। দারোয়ান, ড্রাইভাররা যে যার কোয়াটারে গভীর নিদ্রামগ্ন। বংশীর ঘুম পেয়েছিল খুব। গিয়ে শুয়ে পড়েছিল নিজের ঘরে। আসলে সে ওদের কাছ থেকে সরে পড়তে চেয়েছিল। যা খুশী করুক ওরা।

এর পরের ঘটনার সাক্ষী বংশী নয়। কিন্তু বেণীর কাছে শুনেছিল সব। বংশী সে সব কথা বলেছিল আমাকে। হাজিরে দিতে ওদের আসতে হত টাইম-অফিসে। নাইট ডিউটি পড়লে কাজের চাপ থাকত না। এদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতাম। ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করতাম রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত। সেই সময় পর্যন্ত কোন কোন রাত্রে মিঃ এবং মিসেস টেম্পল সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়েছেন। কখনো মিঃ ব্রাউন একা। ধরা পড়ার ভয় ছিল।

বংশী চলে যেতে বেণী অভ্যর্থনা জানাল লাল্‌তাকে—আও লাল্‌তা, এহি মেরা ঘর।

ললিতা ঘরে ঢুকে পড়ল। চারদিক দেখল চেয়ে চেয়ে। একখানা চৌকিতে পরিষ্কার বিছানা পাতা। একপাশে একখানা ছোট্ট আলনা, তাতে ব্যবহৃত কাপড়, জামা রাখা আছে। এককোণে একটা টিনের স্যুটকেশ। অন্যদিকে তোলা উনুন, তরকারীর ঝুড়ি, মাটির কলসী, বালতি ইত্যাদি।

বেণী বলল—বৈঠ।

লালতা বেণীর বিছানার ওপর বসল। সমস্ত স্নায়ুতে একটা অসহ্য উত্তেজনা অনুভব করল বেণী। কম্পিত হাতে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, লালতা বাধা দিল—কেয়ারী মাৎ বন্ধ করো।

দরজা ভেজিয়ে পিছন ফিরে নিম্নকণ্ঠে বেণী জিজ্ঞাসা করল—ক্যাহে?

—কোই জরুরৎ নেহি।

করুণমুখে এগিয়ে গেল বেণী ওর দিকে। ওর চোখে চোখ রাখল। ওর দুই বাহুমূল ধ'রে তুলে বুকে চেপে ধরল। তারপর ভাষাহীন নীরবতায় দুজনেই সাগ্রহে স্পর্শ করল দুজনার অধর।

কিছুক্ষণ পরে লালতা বলল—গঙ্গা কিনারে ঢুলুয়া হ্যায় বোলা থা না? সাব আউর মেমসাব ঢুলতা হ্যায়?

—হাঁ, হাঁ, ঢুলুয়া হ্যায়।

—তো চলো, হামলোক দোনো ঢুলেগা!

—লেকিন উ তো মেমসাবকে লিয়ে।

—উ লোকন আভি হ্যায় কিধার? নিদ্ গ্যয়া নেহি?

—ও বাৎ ঠিকই হ্যায়, লেকিন—

—লেকিন ছোঁনা মানা হৈ!

—হাঁ, হাঁ, ঠিকই শোচা—

—ইধার জানানা লেকে আনা ভি তো মানা হ্যায়, লেকিন লে আয়া হ্যায় কাহে নাগর?

—তুমহারা লিয়ে কুছ মানেগা নেহি আজ—চলো!

ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে গঙ্গার ধারে গেল। এ জায়গাটি বহু

অর্থব্যয়ে নন্দনকাননের মত তৈরী করা হয়েছে। সাহেব-মেমের বিহার ক্ষেত্র এটি।

ওরা দুজনে চারধার দেখতে দেখতে গিয়ে বসল দোলনায়। অল্প অল্প দুলতে লাগল। টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল ; সুরেলা কণ্ঠের মৃদু হাসি রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। মাঝে মাঝে আবেগ ভরা চুম্বন। এ সবের সাক্ষী রইল সারি সারি ঝাউ গাছ, মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ আর সম্মুখে দুই তীরের দীপমালা প্রতিবিম্বিত প্রবহমানা ভাগীরথী।

কতবার বেণী বলেছে,—চল, ঘরে চল—হোমের উপচার সংগ্রহই সার হবে শুধু ? পূর্ণাহুতি দিতে হবে না ?

লাল্‌তা তত ওর হাতখানা চেপে ধরছে। না, এই বেশ লাগছে। এর বেশী নয়।

কোথা দিয়ে সময় বয়ে যাচ্ছিল, দুজনের কেউ খেয়াল করে নি।

হঠাৎ ওদের সচকিত করে পাশেই জুট মিলের ভোঁ বেজে উঠল কর্কশ-স্বরে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টর্চের বাতি পড়ল ওদের মুখে।

সাক্ষাৎ যমদূতের মত এগিয়ে এলেন মিঃ ব্রাউন। তাঁর পিছনে মিসেস টেম্পল। মিঃ ব্রাউন পরের বউ নিয়ে প্রত্যহ ভোরে আসেন এদিকে বেড়াতে। দোলনায় দোল খান কখনও কখনও দুজনে। এসে দেখেন, কারা যেন দোল খাচ্ছে। কাছাকাছি এসে চিনতে পারেন বেণী-লালকে। তার পাশে একটা জেনানা বসে।

কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ ব্রাউন। একটা পাথরের স্ট্যাচুর মত। হয়ত ভাবলেন, ওটা কি কোন অশরীরী আত্মা ? বেণীলালের দেহ ধারণ করে বসে আছে, তার পাশে কি ওটা পেত্নী নাকি ? বেঙ্গলে ভূত-প্রেতের উপদ্রবের কথা অনেকবার শুনেছেন তিনি।

কিন্তু তাহ'লে তো অন্ধকারে মিশে যেত। নিশ্চয় বেণীলাল। কেমন অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে পড়েছে মাথা হেঁট করে। কে ঐ জেনানা ?

ক্রোধে ফেটে পড়লেন মিঃ ব্রাউন—What the hell you baggar? ও কোন্ হ্যায়?
বেণী তখন কাঁপছে—মেরী জে-না-না-সাব!
—জেনানা? আভি নিকাল দেগা তুম্‌কো—কানুন নেহি জানতা—নিকালো—ব্লাডি, সোয়াইন—
প্রায় ছুটতে ছুটতে বেণী চলে গিয়েছিল লাল্‌তাকে নিয়ে। গেটের বাইরে একটা রিক্সা ভাড়া করে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল তাকে। ফিরে চলে আসবার সময় লাল্‌তা হাত ধরেছিল—ক্যা হোগা?
দাঁতে দাঁত চেপে বেণী বলেছিল—উ শালা ফেক্‌টরী কা অন্দর মজা লুটতা হ্যায়, হামকো বলতা হ্যায় নিকালো—শালা! তুম ভি কোম্পানীকা নোকর হ্যায়, ম্যয়ভি নোকর হ্যায়—মহব্বত হামলোক করণে নেহি সেক্‌তা?
ভাঙের নেশা ছুটে গিয়েছিল লাল্‌তার। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল কুছ তো না হই? তুমহারা নোক্‌রী—
—জানে দেও, কোই পরোয়া নেহি—
লাল্‌তার হাত ছাড়িয়ে চলে এসেছে বেণী। উদ্‌ভ্রান্তের মত কারখানায় ফিরল। নিজের ডেরায় গিয়ে ঘুমুল সারাদিন।
তারপর জল ঘোলা হল কদিন ধরে। চার্জশীট দেওয়া হল বেণীকে। এনকোয়ারী হল। গেটে কর্মরত দারোয়ান আর বংশী সাক্ষ্য দিল। অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেল। কারখানার আইন ভঙ্গ করেছে। এই জঘন্য নৈতিক অপরাধের বরখাস্তই হল যোগ্য শাস্তি।
ডিসচার্জ লেটারখানা নিয়ে যুদ্ধে পরাভূত সৈনিকের মত মাথা নীচু করে কারখানা থকে বিদায় নিল বেণীলাল।
বংশীর মুখে শুনলুম, যাবার সময় তার চোখ ছল ছল করেছিল। এমন চাকরী কি সে আর কোথাও পাবে? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারল বেণী।
এই হল বেণীলালের চাকরী হারানোর মোটামুটি কাহিনী। আমার

চাকরী নেবার মাসখানেকের মধ্যেই ঘটল ঘটনাটা। মনের মধ্যে গভীর ভাবে দাগ কেটে বসল।

মনে মনে ভেবেছি কতবার, বেণী সব জেনে শুনেও কেন এমন কাজ করল ? প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে ? বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ? বুঝতেই পারে নি, আইনের খড়্গ তার শিরে পড়বে ? প্রেমে মানুষ সত্যি সত্যি অন্ধ হয়ে যায় ?

ভাবতে ভাবতে মনে হয়েছে, এর নাম যৌন বিকৃতি। প্রেম নয়। এটা হল যন্ত্র-সভ্যতার অভিশাপ। এই বিকৃতি কত ভাবে কতজনার মধ্যে দেখেছি, আমিও হয়ত বাদ পড়ি নি।

কদিন পরের কথা। সেটা আমাদের মাইনে পাবার দিন।

কারখানা চালু হবার সময় থেকে বেশ কিছুদিন ষ্টাফেদের মাইনে আসত বোম্বে থেকে এয়ার মেলে কলকাতা অফিসে। মিঃ ব্রাউন মাইনের আগের দিন সিটি অফিস থেকে মাইনের খামগুলো নিয়ে আসেন। সেবার কোন কারণে আগের দিন আনা সম্ভব হয় নি। মাইনের দিনটিতেই গেছেন। তাঁর সঙ্গে মিসেস টেম্পল গেছেন কলকাতা।

ওঁদের আসার নামগন্ধ নেই। অফিসের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ষ্টাফেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন মাইনের জন্যে। অনেকে এসে ভীড় জমিয়েছেন টাইম-অফিসে। কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে বাড়ী চলে গেছেন।

টাইম-অফিসে কাজ করতে করতে নানাজনের নানান সরস মন্তব্য কানে আসছে। মিঃ মুস্তাফি এবং মিঃ চাচাই সকলের ওপরে যাচ্ছেন। তাঁদের মন্তব্য শুনতে শুনতে আমার কান লাল হয়ে উঠছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সকলেই তাঁদের কথা বেশ উপভোগ করছেন। এমন কি নীরসতম ব্যক্তি মিঃ দত্তর মুখেও মৃদু হাসির ঝিলিক।

টাইম অফিসে আসর জাঁকিয়ে যখন গুলতানী চলছে, সেই সময়ে পাইপ টানতে টানতে মিঃ টেম্পলের হঠাৎ আবির্ভাব। এতগুলি লোককে এইভাবে দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। কেউ বসে আছেন

টেবিলে, কেউ চেয়ারের হাতলে, কেউ চেয়ারে, কেউ আবার দাঁড়িয়ে।

মিঃ টেম্পল রোগা বেঁটে-খাটো-মানুষ। পরণে হাফ প্যাণ্ট, গায়ে হাফ শার্ট। শুনেছি মিসেসের চেয়েও বয়সে ছোট। দেখেও তাঁকে খুব অল্প বয়স্ক মনে হয়। মানুষটা রসিক খুব। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—What's the matter ?

মুস্তাফি সবচেয়ে ফরোয়ার্ড। জবাব দিলেন—Waiting for Mr. Brown. (মিঃ ব্রাউনের জন্যে অপেক্ষা করছি।)

—Oh, I see—for salary packets ? (ও হ্যাঁ—মাইনের জন্যে)

—Yes, He should have returned. (হ্যাঁ, তাঁর এতক্ষণ ফেরা উচিত ছিল)

—Certainly, God knows, what happened with them. (নিশ্চয়ই ; ভগবান জানেন, তাদের কি হয়েছে)

—Is your Mrs. also with him ? (আপনার স্ত্রীও কি তাঁর সঙ্গে গেছেন ?)

—Yes, she is. I wonder, if he has fled away both with money and my wife. (হ্যাঁ গেছে। আমি ভাবছি, মিঃ ব্রাউন একসঙ্গে টাকা আর আমার বউকে নিয়ে পালাল কিনা)

উপস্থিত সকলেই অট্টহাস্য করে উঠল। কথাটায় আমার কিন্তু হাসি পেল না। এই আপাত-রসিকতার আড়ালে তাঁর অন্তরের হাহাকার আমার কানে এসে বাজল। হয়ত কারণটা জানা ছিল বলে।

মিঃ টেম্পল বেদনার্ত হৃদয়ে দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াতেন। শুনেছি, তাঁর স্ত্রীর নাকি অঢেল ধন সম্পত্তি আছে দেশে। তাছাড়া স্ত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁদের রীতি নয়।

মিঃ টেম্পলের কার্যকাল খুবই সামান্য। তাঁকে ভাল করে দেখার সুযোগ কমই পেয়েছি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই মনে হয়েছে, লোকটি

ভাল। কারও সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা ছিল না তাঁর মধ্যে। নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে মিশতেন সকলের সঙ্গে।

কয়েকদিন আগে সকালেই ভিজিটে এসেছিলেন মিঃ টেম্পল। শ্রমিকদের কার্ডগুলো উপছে পড়ছিল বাক্স থেকে। শ্রমিকরা 'ইন' এবং 'আউট' হবার সময় কার্ডগুলো পাঞ্চ করে বাক্সয় ফেলে। আমরা সেগুলো নিয়ে এসে কাজের পরিমাণ বসাই।

সেদিন উপচীয়মান কার্ডগুলো দেখে মিঃ টেম্পল জিজ্ঞাসা করলেন—How is it ?

আমি বললাম—I am clearing the box, just now. (বাক্স এখনই পরিষ্কার করে দিচ্ছি।)

তারপর তিনি টেবিলের দিকে চেয়ে দেখেন এক রাশ ধুলো। এমন অপরিষ্কার থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অভিযোগ করলাম, অফিস-বেয়ারারা সাফ করে দেয় না।

শুনে খানিকক্ষণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। এটা ছোট কারখানা। একজনকেই পাঁচটা কাজ হাতেনাতে করে নিতে হবে। আমাদের দেশে সেই রকমই করে থাকি। এতে আমরা মোটেই লজ্জা বোধ করি না। কাজকে ভালবাসতে হবে। তবেই কাজ ভালবাসবে তোমাকে। তুমি নিজের হাতে টেবিল সাফ করে নেবে, একটা পেপার পাঠাতে হলে বয়ের আশায় বসে থেকো না—এক গ্লাস জল পান করার প্রয়োজন হলে নিজেই গিয়ে খেয়ে আসবে কল থেকে।

আমি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। কোন রকম মন্তব্য করার সাহস হল না।

আর একদিন রাত্রে সস্ত্রীক ভিজিটে বেরিয়ে টাইম-অফিসে এলেন। কাজকর্ম কেমন চলছে জিজ্ঞাসা করলেন। সেইসময়ে বয়লারের একজন খালাসী এসে অভিযোগ করল—সাব, আদমি কম্‌তি হ্যায়, আদমি দেদিজিয়ে। নেহি তো হামলোক মর জায়েগা কুইলা গাড়ী ঘিঁসতে ঘিঁসতে।

মিঃ টেম্পল আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কি বলছে, বুঝতে পারছি না।

আমি ওদের অভিযোগের মর্মার্থ খুলে জানালাম। শুনে তিনি বললেন—Ask him to bring two men from outside. I shall immediately appoint them. (একে বল বাইরে থেকে দুজন লোক ডেকে আনতে, আমি এক্ষুণি তাদের কাজ দেব।)

একজন ছুটে চলে গেল তাঁর একটা স্লিপ নিয়ে। গেটেই ক্যাজুয়াল কাজ পাবার লোভে দিনরাত অপেক্ষা করে লোকেরা। যে গেল, নিজের জানাশোনা দুজনকে নিয়ে ফিরে এল সঙ্গে সঙ্গে। মিঃ টেম্পল তাদের কাজে ভর্তি করে নিলেন। টাইম-অফিসের খাতায় তাদের নাম তুলে নিলাম। তিনি সই করে দিলেন।

বোম্বেতে মাঝে মাঝে ম্যানেজারদের মিটিং হয়। কোম্পানীর অগ্রগতি কি ভাবে হতে পারে, শ্রমিকদের প্রতি কিরূপ নীতি গৃহীত হবে, কোন্ কারখানার কেমন উন্নয়ন হবে, সেই সব বিষয়ে আলোচনা হয় এই অধিবেশনে। হেড্ অফিস থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে মিঃ টেম্পল সেদিন ফ্লাই করলেন যোগদানের জন্যে। মাত্র তিনদিনের প্রোগ্রাম। মিসেস রইলেন একা।

মিসেস টেম্পল এবং মিঃ ব্রাউনকে নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা। তিনটে দিন তাঁদের অবাধ মেলামেশার সুযোগে কী যে মহাপ্রলয় ঘটে যাবে, সেই মুখরোচক আলোচনায় অনেকের রসনাই মুখর।

সেটা মাসের প্রথম সপ্তাহ। মাসের প্রথম সাতদিন টাইম-অফিসে কাজের চাপ খুব বেশী থাকে। সাত তারিখে শ্রমিকদের বেতন হয়। হিসেবপত্রের দায়িত্ব আমাদের।

ছ' তারিখে আমার মর্নিং ডিউটি। হরুদা জেনারেল শিফ্টে, কিন্তু সেদিন হঠাৎ অনুপস্থিত হয়েছেন।

মিঃ চাচা কুটো ভেঙ্গে দুটো করেন না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তিনি

ওপরে অফিসে যান, ডিপার্টমেণ্টে ঘোরাফেরা করেন, নয়ত নিজের চেয়ারে এসে বসে থাকেন চুপচাপ।
অবশ্য কাজ তাঁর করার কথা নয়। তিনি আমাদের 'বস্'। আমাদের দিয়ে কাজ শুধু করিয়ে নেবেন।
ছ' তারিখে আমি একা হিসেবের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি ; মিঃ চাচা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে জানে। হঠাৎ মিঃ ব্রাউন এসে খোঁজ নেন
—Where is Mr. Chacha and Ganguly ? (মিঃ চাচা এবং গাঙ্গুলি কোথায় ?)
—Mr. Chacha is somewhere in the Factory and Mr. Ganguly is absent. (মিঃ চাচা কারখানার ভেতরে গেছেন, মিঃ গাঙ্গুলি আসেন নি)
—Absent ? How is it ? (অনুপস্থিত, সেকি !) How far your calculation ? (হিসেবের কতদূর ?)
—I am struggling sir. (আমি করছি মশায়)
—Look Bandopadhyaya, keep everything ready. Typing, totalling the wages sheet, filling the perforated sheets inside the envclops and send all these at my Bunglow within 10 P. M. sharp. Otherwise I shall sack you—and tell Ganguly to see me when he joins tomorrow. (বন্‌ডোপাঢায়, টাইপ, টোটাল, খামের মধ্যে স্লিপ ভরা সব সেরে ঠিক রাত দশটার মধ্যে আমার বাংলোতে পাঠিয়ে দেবে। নইলে তোমাকে দূর করে দেব আর গাঙ্গুলি কাল এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।
মিঃ মুখার্জী বি শিফ্‌টে। চক্রবর্তী রাত্রে। অতএব আমিই তাঁর সাক্ষাৎ শিকার হলাম। হুকুম দিয়েই মিঃ ব্রাউন চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদেই কোম্পানীর গাড়ীটা বেরিয়ে গেল তাঁকে আর মিসেস টেম্পলকে নিয়ে।

প্রবেশনারী পিরিয়ড্ তখন। উঠতে বসতে শুনতে হত মিঃ ব্রাউনের গালমন্দ। 'ব্লাডি হেল, কিপ দিস রেডি। অর্ আই শ্যাল স্যাক ইউ।' প্রাণের দায়ে করতেই হত। সেদিন অসাধ্য সাধন করতে হল আমাকে। টাইপ জানি, কবুল করেছি। অতএব পরিত্রাণ নেই। টাইপ করতে হল, টোটাল দিতে হল পাতার পর পাতা ওয়েজেস শীট। মিঃ মুখার্জী এসে কিছুটা সাহায্য করলেন।

সব কাজ সেরে যখন মিঃ ব্রাউনের বাংলোতে ওয়েজেস শীট, খাম ইত্যাদি রাখতে গেলাম, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। অথচ আমার ডিউটি দেবার কথা ছিল বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত।

সারাদিন একটানা পরিশ্রম করে মাথার শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। মিঃ ব্রাউনের বাংলো দোতালায়। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বাংলোর সামনের লনে চেয়ার পেতে বসে আছেন পাশাপাশি। আমাকে বাংলোর দিকে আসতে দেখে মিঃ পেরেরা জিজ্ঞাসা করলেন—What do you want? (কি চাই?)

উদ্দেশ্য বললাম। তিনি দোতলার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলেন। আমি ওপরে উঠে গেলাম। কলিং বেল টিপতেই বয় এল। শুনলাম, মিঃ ব্রাউন নেই। তার হাতে কাগজপত্র দিয়ে নেমে এলাম।

দেখলাম ইঞ্জিনিয়ার দম্পতি ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে গেছেন।

মাটিতে পা দিতেই ভিজে বাতাস ছুটে এসে গঙ্গার শীতল স্পর্শ দিল খানিক। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। মনে হল, কে যেন শীতল করস্পর্শ বুলিয়ে দিল। আর খানিক সেই স্পর্শের আকর্ষণে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম জেটির দিকে। মাথার যন্ত্রণার উপশম হয়ে আসছিল।

জেটিটা গঙ্গার ওপরে খানিকদূর চলে গেছে। জেটির পাটাতনে পা দিতেই নীচে ঢেউ আছড়ানির শব্দ কানে এল। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। আলো-আঁধারি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দেখি, জেটির শেষ

প্রান্তে উজ্জ্বল আলোর নীচে গঙ্গার দিকে মুখ করে বেঞ্চে বসে আছেন মিঃ ব্রাউন আর মিসেস টেম্পল। খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে।
নিঃশব্দে ওখান থেকে ফিরে এলাম।

৫

পশ্চিমীরা মাখনের ভক্ত, আমরা ঘিয়ের। পশ্চিম দুনিয়া মাখনের বিকল্প আবিষ্কার করেছে মার্গারাইন। ওদের দেশে এই জাতীয় স্নেহ-পদার্থেরই বেশী চাহিদা। পাউরুটির সঙ্গে মাখন। মাখন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যেতেই মার্গারাইনের আবির্ভাব। পশ্চিম দুনিয়া একে স্বাগত জানিয়েছে আন্তরিকভাবে।
রুটি মাখনের বিলাসিতা ভারতের নেই। ভারতীয় হিন্দু সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে গোমাতার পূজা করে। তার কল্যাণে এককালে ঘরে ঘরে ছিল ভাঁড় ভর্তি ঘৃতের সঞ্চয়। ক্রমে গোলার ধানের মতই সে সঞ্চয় ফুরিয়ে এল। সাধারণ মানুষের স্নেহপদার্থের চাহিদা মেটাতে এদেশে আবির্ভাব হল বনস্পতির।
ভারতীয় ভ্রাতা বনস্পতির পশ্চিমা ভগিনী মার্গারাইন। জাতি হিসেবে এক, পূর্ব-পশ্চিমের অধিবাসীরা সবাই যেমন মানুষ।
মানুষের যেমন রাম, রহিম, প্রভৃতি নাম থাকে, বনস্পতির তেমনি অনেক নাম। বিভিন্ন কোম্পানীর হরেক রকম পেটেণ্ট। কিন্তু বনস্পতি বলতেই যে নামটি সবার মনে প্রথমেই উদয় হয়, সেটি আমাদের কারখানতেই উৎপন্ন হয়।
একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি এবং হেসেছি মনে মনে। বনস্পতি ব্যবহার না করার ভান করে বহুলোককে বনেদীয়ানার বড়াই করতে দেখেছি। আবার এও দেখেছি, সে বড়াই শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। এরই জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন দোকানে দোকানে। বহু কষ্টে একটি টিন সংগ্রহ করতে পেরে কৃতার্থ হয়েছেন।

আমি যাঁর বাড়ীতে ভাড়া থাকি, সেই মাসীমা তাঁদেরই একজন। বনস্পতি কারখানায় চাকরী নিয়েছি শুনে তিনি ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললেন—ও সব ছাই পাঁশ কি দেশে চলবে? গভরমেণ্ট তো বন্ধ করে দেবে শুনছি। তার চেয়ে ইস্কুলের চাকরীই ভালো ছিল বাপু। ইস্কুল তো কোনদিন উঠে যাবে না।

আমি চুপচাপ শুনে যাই। উচ্চবাচ্য করতে গেলে ঝগড়া করতে হয় মাসীমার সঙ্গে।

অবশ্য মাসীমাকে দোষ দিতেও পারি না। বনস্পতির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা ছিল উনিশশো পঞ্চান্ন সন পর্যন্ত। সেই বছরই ইণ্ডিয়া গেজেটে 'প্রিভেনসান অফ্ ফুড এ্যাডাল্টারেশান রুলস' প্রকাশিত হলে বনস্পতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটে। ঐ নিয়মে বলা হয় (রুল নং ৩২) প্রত্যেক খাদ্যবস্তুর প্যাকিংয়ে লেবেল ব্যবহৃত হবে। সেই মুদ্রিত লেবেলে খাদ্যবস্তুর ওজন, নাম, প্রকার, উৎপাদক কোম্পানীর নাম ধাম, ব্যাচ নাম্বার থাকবে। উনিশশো ছাপান্ন সালের পয়লা মার্চ থেকে এই নিয়ম বনস্পতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

সে কথা যাক। মাসীমা আবার বললেন—ওটা শুনেছি নাকি জন্তুর চর্বি থেকে তৈরী? খেলে নাকি মানুষের চোখ নষ্ট হয়ে যায়?

আমি জবাব দিই—সঠিক জানিনা মাসীমা।

কি থেকে বনস্পতি তৈরী হচ্ছে, সে তো প্রত্যহ দেখছি। যে জিনিষ বিশুদ্ধ বাদাম আর তিল তেল দিয়ে তৈরী, তা যে জন্তুর চর্বি থেকে তৈরী হতে পারে, এ ধারণা কেমন করে এল? এই অজ্ঞতার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? আমার মনে হত, আমি যদি কোম্পানীর প্রচার অধিকর্তা হতাম, তাহলে এই ভুলটাই লোকের মন থেকে আগে দূর করবার চেষ্টা করতাম।

বনস্পতি সম্পর্কে লোকের অজ্ঞতার ব্যাপারে একটা মজার কথা মনে পড়ছে। বিশ্বকর্মাপূজোয় নারীপুরুষ যে কোন দর্শক কারখানায়

ঢুকতে পারেন। তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্যে পূজাকমিটি ভলেন্টিয়ারের ব্যবস্থা করেন আগে থেকেই। আমি এই ধরণের কাজ পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছিলাম কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে।

সন্থ দেশ থেকে আগত এক বিহারী দর্শক একজন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করছে শুনতে পেলাম—বাবুজী,এক বাৎ আপকো পুছেগা ?

স্বেচ্ছাসেবক বন্ধু জবাব দিলেন—হ্যাঁ পুছিয়ে।

—ই তো ঘিউ কারখানা হ্যায় ?

—নেহি, ইয়ে বনস্পতি কারখানা হ্যায়।

—ওভিতো এক কিসিমকা ঘিউ হ্যায় বাবুজী ?

—হ্যাঁ, ও বাৎ ঠিক হ্যায়।

—তব্ বাবুজী, ইধার একঠো গৌ নেই দেখ্‌তা, ই ক্যা ?

সত্যি তো, একটাও গরু দেখা যাচ্ছে না, লোকে তাহলে ঘিউ কারখানা বলে কেন ?

আমি এগিয়ে গিয়ে তার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছি। তারপর কেবলই ভেবেছি, বনস্পতি সম্পর্কে লোকের এমন অজ্ঞতার কারণ কি ?

দেখেছি অজ্ঞতা নিজেরও কম নয়। সত্যি বলতে কী, অপরের অজ্ঞতা দেখেই একথা টের পেয়েছি। তারপর থেকেই আদি-অন্ত নাড়ী-নক্ষত্র জানবার জন্যে প্রচণ্ড কৌতূহল বোধ করেছি।

কেমন ক'রে বনস্পতি ইনডাষ্ট্রি এদেশে গড়ে উঠল? এর উৎস কোথায় ? কোন্ দেশে প্রথম এই বস্তুটির আবিষ্কার ? কে বা কারা সেই চারাটিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে পরিণত ক'রেছে বনস্পতি মহীরুহে ?

এই অনুসন্ধিৎসার ফলেই জানতে পেরেছি ডাঃ চৌধুরীর কথা। ভারতে বনস্পতি ইনডাষ্ট্রির অন্যতম পুরোধা ছিলেন তিনি। কিন্তু তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ঘিয়ের বিকল্প বনস্পতির জন্মেতিহাস এদেশে এখনো লেখা হয় নি। মাখন থেকে মার্গারাইনের কথা কিন্তু ওদেশে লেখা হয়েছে। ইংলণ্ড,

জার্মেনী প্রভৃতি দেশের মনীষিরা এই বিকল্প স্নেহপদার্থের উপযোগিতা ব্যক্ত করেছেন মুক্ত কণ্ঠে।

ইংলণ্ডের শিল্পপতি মিঃ এফ. সি. লোভেল বলেছেন—I believe, that in the large towns of the North. Butterine and bread is the staple food of the children of poor people. (আমি বিশ্বাস করি, উত্তরাঞ্চলের বড় বড় শহরের দরিদ্র মানুষের পুত্রকন্যাদের পুষ্টিকর খাদ্য রুটি আর বাটারাইন)

জার্মেনীর ডাঃ হেন্‌রিচ্‌ ফ্যাঙ্কেলের বক্তব্যের বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রাঞ্জল—It is an undoubted fact that the broad masses, to whom previously only a heterogeneous assortment of facts, not always very good ones, was available to satisfy their vital need for fats, see in margarine an enrichment of their diet. About eighteen to twenty million people to whom the price of butter is prohibitive and who would, therefore, otherwise be mainly dependent on hog lard i. e. mainly American lard, are thanks to margarine, provided with a cheap substitute which is nevertheless remarkably similar to butter as regards both external and internal qualities.

কারখানার নীরসতম ব্যক্তি মিঃ গুনময় দত্ত। বহুগুণে বিভূষিত তিনি, একথা স্বীকার করতেই হবে। Cost Accountancy পাশ করেছেন, এদিকে আবার এম. এ.। কোনটিই কাজে লাগে নি বনস্পতি কারখানার চাকরীতে। অয়েল রিসিভিং সেকসনের টেক্‌নিকাল ষ্টাফ মিঃ দত্তের দুঃখের কথা একদিন তাঁর মুখেই শুনেছি। ওয়েয়ার (weigher) সান্যালের অনুপস্থিতিতে এভারি স্কেলে তেলের ওজন নিতে নিতে একদিন তিনি বললেন—কষ্ট্‌ এ্যাকাউণ্টেন্সী

আর এম. এ. পাশ করে পেটের দায়ে কি করতে হচ্ছে দেখুন। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

মিঃ দত্তের জীবনে এইটেই বড় ট্রাজেডি নয়। পারিবারিক জীবনেও একটা মস্ত ফাঁক ছিল। তাঁর স্ত্রী বিকৃত মস্তিষ্ক।

মিঃ দত্ত ধীর স্থির, কথাও বলেন ধীরে ধীরে। অফিসের কাজে-কর্মে তিনি বেশ ক্লান্তি অনুভব করেন। যেন তাঁর একেবারেই করতে ইচ্ছে নেই, পেটের দায়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হচ্ছে।

কাজের চাপও অবশ্য তাঁর কম ছিল। মিঃ দত্ত সময় কাটাতেন পড়ে। কোম্পানীর বিভিন্ন জার্নালগুলি তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। দেশে-বিদেশে প্রকাশিত কোম্পানীর পত্র পত্রিকার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রশ্নটা। আমার মনে হয়েছিল, কেউ এর জবাব দিতে পারলে একমাত্র তিনিই পারবেন।

—কেমন ক'রে বনস্পতি ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়ে উঠল মিঃ দত্ত ?

মিঃ দত্ত একটু চিন্তা করলেন মনে মনে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আদার ব্যাপারী হ'য়ে জাহাজের খবরে কি দরকার আপনার ?

আমি মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললাম—জান্‌তে ইচ্ছে করে মিঃ দত্ত। আমার মনে হয়, একমাত্র আপনিই আমার কৌতূহল মেটাতে পারেন। আর কেউ নয়।

মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো কমার্সের ছাত্র ছিলেন, তাই না ? পড়েন নি অর্থনীতির বইয়ে, কেমন কার ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠে ?

আমি জবাব দিই—ও পাশ করবার জন্যেই পড়েছিলাম। সব ভুলে মেরে দিয়েছি। আপনি বলুন মিঃ দত্ত। আমার কৌতূহল বনস্পতির ঠিকুজি-কুষ্ঠি জানতে। আমার বিশ্বাস, আপনার কাছ থেকেই সবকিছু জানতে পারব।

মিঃ দত্ত আমার কথাটা বেশ উপভোগ করলেন। মৃদু একটি আত্ম-প্রসাদের হাসি তাঁর বিরস মুখের কঠিন রেখাগুলিকে কোমল ক'রে

তুলল। একটু চিন্তা ক'রে তিনি বললেন—গাছ যেমন অজস্র শিকড় দিয়ে প্রাণশক্তি আহরণ করে, শিল্পও তেমনি। শিল্পের বেলায় শিকড়গুলির নাম হ'ল অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং ব্যক্তিগত প্রেরণা। আবিষ্কারক একটি চারা গাছ রোপণ করেন, তাকে যত্ন করে বড় করে তোলেন পুঁজিপতিরা। সেই চারা গাছটি একদিন মহীরুহে পরিণত হয়ে মানুষের সমাজকে ছায়াদান করতে থাকে। মানুষ তার ফল ভোগ করে তৃপ্ত হয়।

—মিঃ দত্ত, ধরুন, চারা গাছটি যদি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে তাহলে ?

—উত্তর খুবই সোজা সত্যব্রতবাবু। চারাগাছটির অপমৃত্যু ঘটে। কত আবিষ্কার এমনি ক'রেই প্রতিকূল অবস্থার চাপে মানুষের কাজে লাগল না। শিল্প-উদ্যোক্তা যদি দেখেন, দেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব নেই, অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল, শিল্প প্রসারের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, তখন স্বভাবতঃই তিনি কোনও আবিষ্কারকে গ্রহণ করতে, সেটাকে উন্নততর প্রণালীর মধ্যে এনে ব্যাপক উৎপাদনের কাজে লাগাতে চাইবেন না। সত্যি করে বলতে গেলে, যে দেশের সামাজিক অবস্থা এই রকম, সেখানেই উদ্যোক্তার অভাব। শিল্পে সে দেশ কিছুতেই অগ্রসর হতে পারে না।

—আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে, শিল্পের প্রসার কোথায় তেমন ?

—দেশ একধাপ এগুলে শিল্প দু'ধাপ এগুবে কি ক'রে ?

—রাজনৈতিক স্থায়িত্বই শিল্প গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত পালন করে, তাই নয়কি মিঃ দত্ত ? এরপর শিল্পে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত হয়। আমাদের দেশেও তাই হবে, এই কথাই তো বলতে চান আপনি ?

মিঃ দত্ত একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললেন—আমাদের দেশে কি হবে না হবে, সেকথা এখনই বলা সহজ নয়। সবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয়েছে, কৃষির উন্নতিই যার আসল লক্ষ্য। এরপর দু' চারটে পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'ক, তখন এ সমস্ত কথা আলোচনা করা যাবে। আসলে আপনার জিজ্ঞাস্য কি? বনস্পতি ইন্ডাষ্ট্রি কেমন ক'রে গড়ে উঠল, কেমন কিনা?

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম—হ্যাঁ। ঠিক তাই।

মিঃ দত্ত বললেন—সেই কথাটাই শুনুন তাহ'লে। শুধু ইতিহাস নয়, ভূগোলকেও টেনে আনতে হবে এর মধ্যে। কেননা শিল্পের যে আর একটি বড় ভূমিকা,—যানবাহন চলাচল,—ভূগোলই সেটা নির্দিষ্ট করে দেয়। ভূগোলই অংশত স্থির করে, কি ধরণের কি পরিমাণ কাঁচামাল কোথা থেকে পাওয়া যাবে আর উৎপাদিত পণ্যের বাজারই বা কেমন হবে। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝাচ্ছি। যেমন ধরুন, নদী এবং সমুদ্র। এরা বাধা না হয়ে বরং খুবই উপকারে লাগে। নদী এবং সমুদ্রপথে খুব অল্প খরচে শিল্পের কাঁচামাল আসে, পণ্য বাজারে যায়। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক যত রকম সুযোগ সুবিধে দরকার, নেদারল্যাণ্ডে তা ছিল বলেই সেখানে মার্গারাইন শিল্প প্রসার লাভ করতে পেরেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অর্থাৎ নেদারল্যাণ্ডেই এই বিকল্প স্নেহপদার্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে?

মিঃ দত্ত বললেন—না, একজন ফরাসী রাসায়নিক মার্গারাইনের ফরমূলা প্রথম বার করেন। এ আবিষ্কারের গৌরব ফ্রান্সের, আর কোন দেশের নয়। অবশ্য একথা ঠিক,—ডাচ্ মাখন ব্যবসায়ীরাই এই ফরমূলা কাজে লাগিয়েছিলেন আর তা করেছিলেন প্রধানতঃ ফ্রান্স থেকেই প্রথম প্রথম কাঁচা মাল নিয়ে। ইংরেজদের জন্যেই এটা উৎপন্ন হত, পরে জার্মেনীতেও এর ব্যবহার হতে থাকে।

এতক্ষণ কথা ব'লে একটু দম নিলেন মিঃ দত্ত। মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, এরপর কী বলবেন। তারপর বললেন—আপনার মত এ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ আমারও হয়েছে। সত্যি, লোকে কেন

বলে এটা জন্তুর চর্বি থেকে তৈরী? এর পেছনে সত্যিই কি কোনো কারণ আছে? আমাদের সাহেব মিঃ মেটার কাছে কোম্পানীর জার্নালগুলো পড়বার অনুমতি চাইলাম। তিনি অফিসিয়াল কায়দায় আমাকে জানালেন, এগুলো শুধু ম্যানেজমেণ্ট ষ্টাফের পড়বার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছেন, অবশ্য গোপনে। আমি সেই সব জার্নাল থেকে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য আমার ডায়েরীতে নোট করে নিয়েছি। আপনাকে এনে দেব। পড়ে আমাকে ফেরৎ দেবেন।

আমি কৃতার্থ হ'য়ে বলি—তাহ'লে তো খুবই ভালো হয়। বক্ বক্ করার যন্ত্রণা থেকে আপনিও তাহ'লে মুক্তি পান।

মিঃ দত্ত কাজের ভান করে বললেন—আপনি মশায় সাঙ্ঘাতিক লোক। এখন যান দেখি। কাজ করতে দিন।

সহাস্য মুখে তাঁর কাছ থেকে উঠে এলাম।

যেদিন মিঃ ব্রাউনের হুকুম পালন ক'রে রাত এগারোটায় বাসায় ফিরেছিলাম, মাসীমা জেগেছিলেন তখনো। আমাকে ফিরতে দেখে দোতলার ঘর থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন বাবা সত্য? বিন্দু তো ভেবেই সারা। কেবলই বলছে, কারখানায় খোঁজ নিতে পাঠাও দাদাকে, সত্যদার যদি কোন বিপদ হ'য়ে থাকে? আমি বলছি, কাজ পড়েছে তাই আসতে দেরী হ'চ্ছে,—তা কি হয়েছিল?

জানলার দিকে চেয়ে দেখি, মাসীমার পাশে বিন্দুও এসে দাঁড়িয়েছে। বললাম,—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, কাজ ছিল খুব; একজন যাননি কিনা—

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া হয় নি তো?

সত্য কথা বললে মাসীমা হয়ত এত রাত্রে ব্যস্ত হ'য়ে পড়বেন। তার চেয়ে 'হ্যাঁ হয়েছে' বলাই নিরাপদ। অম্লানবদনে মিথ্যে কথাটা ব'লে ফেললাম—হ্যাঁ, খেয়ে এসেছি।

মাসীমা নিশ্চিন্ত হলেন। আমি মুখ হাত-পা ধুয়ে খালি পেটে ঢক্ ঢক্ ক'রে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। যতক্ষণ না ঘুম এল, কেবলই ঘুরে ফিরে মনে পড়ল বিন্দুর মুখখানা। সে আমার জন্যে চিন্তা করে। এত রাত অবধি জেগে আছে, কিন্তু কেন? তার হৃদয়ে স্নেহের এমন পূর্ণ ভাণ্ড রয়েছে, তাতো জানতে পারি নি এতদিন। অনেকদিন এ বাড়ীতে ভাড়া আছি, কোনদিন বিন্দুর অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আজ নিশীথের চিন্তায় সে আমার মন জুড়ে বসল কেমন ক'রে? স্নেহই তার একমাত্র কারণ; বিন্দু স্নেহময়ী। আমি স্নেহের কাঙাল। তাই অভিভূত হলাম।

সাত তারিখে শ্রমিকদের মাইনের দিন। সেদিনও হরুদা অনুপস্থিত। মিঃ ব্রাউন টাইম অফিসে মজুরদের মাইনের খাম বিলি করতে এসে গর্জন করলেন—Mr. Chacha, did Mr. Ganguli inform you—? (মিঃ চাচা, গাঙ্গুলি কি তোমায় জানিয়েছেন ?)

মিঃ চাচা 'হ্যাঁ' 'না' কোন জবাবই দিতে পারলেন না। এই এক আশ্চর্য মানুষ দেখেছি। কারও অনিষ্ট হ'ক, এটা একেবারেই তিনি চাইতেন না। অপরের দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে বাঁচিয়েছেন কতবার। তখন আমাদের প্রোবেশনারি পিরিয়ড্। ছ'মাস গেলে তবে কনফার্ম হবার কথা। এসময়টা আমাদের কাছে ছিল সন্ত্রাসের যুগ। আমি অন্তত যমের মত ভয় করতাম মিঃ ব্রাউনকে। হরুদা বা মুস্তাফির মত লোক কিন্তু পরোয়া করতেন না।

মিঃব্রাউনের প্রশ্নের জবাবে মিঃ চাচা কোঁতাতে লাগলেন—Actually you see sir—(ব্যাপারটা হয়েছে কি—)

মিঃ ব্রাউন আরও উচ্চকণ্ঠে শাসালেন—Don't try to conceal anything Mr. Chacha, as soon as he joins, tell him to see me—I shall sack him. (মিঃ চাচা, কিছু গোপন করতে চেয়ো না—যখনই সে কাজে আসবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো —আমি তাকে বরখাস্ত করব।)

মিঃ চাচা তাঁর কথায় উচ্চবাচ্য না করে ওয়েজেস কার্ডে ষ্ট্যাম্প মেরে ডাক দিলেন—ট্যালি নাম্বার এইট্রি ফোর—

মিঃ ব্রাউন গজ্‌গজ্‌ করতে করতে খাম এগিয়ে দিতে লাগলেন।

পরদিন হরুদা জয়েন করলেন। মিঃ চাচা সব কথা খুলে বললেন তাঁকে। বললেন—মিঃ ব্রাউন যতই বলুক, আমি বারণ করছি, এখন যাবেন না মশাই বুঝলেন? রাগ কমুক, তারপর যা হবার হবে।

কিন্তু বেলা এগারোটা নাগাদ মিঃ ব্রাউন নিজেই টাইম অফিসে এসে হাজির। মিঃ চাচার ওপর একচোট গায়ের ঝাল ঝাড়লেন। তারপর পড়লেন হরুদাকে নিয়ে। মুখচোখ লাল ক'রে বললেন—কেন বিনা নোটিশে কামাই করেছ, এসব চলবে না,—কেন আসনি?

হরুদা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন—অনিবার্য কারণে আসা সম্ভব হয় নি।

—এ যুক্তি আমার কাছে যথেষ্ট নয়। কোম্পানীও এসব শুনতেও চায় না।

কোম্পানী তাহ'লে কি চায় মিঃ ব্রাউন?

এমন লোককে কোম্পানী 'স্যাক' করতে চায়—

—কোম্পানী মানেই তুমি, তাই না? যা খুশী তোমার করোগে।

হরুদার বুকের পাটা বটে! শুনে আমি ভয়ে শিটকে গেলাম। এরপর হরুদার ভাগ্যে যে কী আছে, সে আর বুঝতে কষ্ট হয় না।

মিঃ ব্রাউন থতমত খেয়ে সামলে নেন—Come with me—(আমার সঙ্গে এস)

হরুদা মিঃ ব্রাউনের পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন। আধঘণ্টা বাদে ফিরে এলেন, যেন কিছুই হয় নি।

মিঃ চাচা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলল মশায়?

একটা বিড়ি ধরিয়ে হরুদা বললেন—জ্ঞান দিলে। আর বললে, টাইম-অফিসে আর রাখব না তোমাকে। ওপরে অফিসে নিয়ে আসব চোখের সামনে।

শুনে সত্যি বলতে কী, আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। মিঃ ব্রাউনের ওপরটা যেমন দেখেছি, ভেতরটা তেমন নয়। তাঁর এই অন্যরূপের পরিচয় পেয়ে আমি হতবাক্।

আবার মনেহ'ল, হয়ত ব্যাপারটা ঠিক তাও নয়; আসলে উনি শক্তের ভক্ত। পরে এ ভ্রম দূর হয়েছিল। সেদিন জেনেছি, মিঃ ব্রাউন মনিব হিসাবে তুলনা রহিত। তাঁর আর যত দোষই থাক।

কয়েকদিন পরে মিঃ ব্রাউন হরুদাকে বললেন—তুমি ব্রিলিয়াণ্ট চ্যাপ, তা বুঝতে পারছি। টাইম-অফিসে পচে মরা তোমার সাজে না। তুমি বি. কম. পাশ করো। আমি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার কোর্স পড়তে পাঠাব তোমাকে। সাক্সেসফুল হ'তে পারলে পার্সোন্যাল অফিসার হতে পারবে।

মিঃ ব্রাউন সোস্যাল ওয়েলফেয়ার কোর্সের একখানা প্রসপেক্টাস দিলেন হরুদাকে। হরুদা কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন—Thank you, let me pass B. Com. first—then—(ধন্যবাদ, আগে বি. কম. পাশ করি—তারপর)

মিঃ ব্রাউন উৎসাহ দিয়ে বললেন—Yes, carry on—wish your good luck. (হ্যাঁ—চালাও—তোমার উৎসাহ কামনা করি)

সবচেয়ে আমার কষ্ট হত নাইট ডিউটিতে এসে। কাজকর্ম বিশেষ কিছুই থাকত না। রাত একটা-দেড়টা নাগাদ টেবিলের ওপরে ফ্ল্যাট হয়ে পড়তাম। এর পরে আর সাহেবদের রাউণ্ডে বেরোনোর সম্ভাবনা বড় একটা থাকত না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। একা একা মুখ বুজে মশার কামড় খেয়ে বসে থাকা যে কী কষ্টকর, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ তা ধারণা করতে পারবেন না। ফিলিং প্ল্যাণ্টে, সেলরুমে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাজের চাপে বিশ্রামের অবকাশ থাকে না। ঘুমও তাই ঘেঁসতে পায়না ধারে কাছে। কিন্তু আমার পক্ষে তাকে ঠেকিয়ে রাখা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল।

একদিন রাত দেড়টায় মিঃ টেম্পল মিসেস সহ উপস্থিত। ভাগ্যিস

যে দারোয়ানটা রাউণ্ডে ছিল কাছাকাছি, দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জাগিয়ে দিয়েছিল। নইলে কি হত বলা যায় না।

কয়েকদিন পরের কথা। খুব ভোর ভোর রাত্রের শিফ্‌ট ফোরম্যান মিঃশীল মুখ চোখ লাল ক'রে এসে বললেন—আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি, আপনি নাইট ডিউটিতে পড়ে পড়ে ঘুমোন।

ইনিই পূর্বতন কোম্পানীর ম্যানেজার ডাঃ চৌধুরীর জামাই। মিসেস অনিতা শীলের স্বামী। কারখানায় তখন তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। মিঃ টেম্পলের একেবারে দক্ষিণ হস্ত বললেই হয়।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি—হাতের কাজ-কর্ম সারা হ'য়ে যায়, রাত একটা-দেড়টা নাগাদ একটু শুই।

মিঃ শীল রুঢ়কণ্ঠে বললেন—কাজ না থাকলে আপনি ঘুমুতে পারেন, মিঃ ব্রাউনের কাছ থেকে সে রকম রিট্‌ন পারমিশান নিয়ে নেবেন। নইলে রোজ রোজ দেখে ব্যাপারটা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। এটা ডিসিপ্লিনের প্রশ্ন। শেষে বাধ্য হয়ে আমাকে ফ্যাক্টরী ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে—

পরের সপ্তাহে 'বি' শিফ্‌টে কাজে এসে মিঃ চাচাকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন—আমি বলছি মশাই, ঘুমুবেন আপনি। আবার কিছু বলতে এলে সোজা ব'লে দেবেন, টাইম-অফিসে আপনাকে ফোঁপর দালালি করতে আসতে হবে না। টাইম-অফিস আপনার অধীনে নয়। বলে দেবেন, মিঃ চাচা এই কথা বলেছে।

ঘটনাটি মিঃ চাচা মিঃ ব্রাউনের কানে তুলেছিলেন, মিঃ ব্রাউন বলেছেন —Tell Mr. Sil to oil his own machine. In future if he pokes his nose in my department, I shall see him. (মিঃ শীলকে নিজের চরকায় তেল দিতে বোলো। ভবিষ্যতে সে যদি আমার ডিপোর্টমেণ্টে নাক গলায় তাহ'লে দেখে নেবো তাকে)

রাত্রে ডিউটি দেওয়ার যন্ত্রণা বেশী দিন সহ্য করতে হয় নি। কিছুদিন পরে মিঃ ব্রাউন একদিন টাইম-অফিসে জিজ্ঞাসা করলেন—নাইট-

শিফ্‌ট তুলে দিলে কেমন হয় মিঃ চাচা? আমি ভাবছি টাইম-অফিসে দু' শিফ্‌ট চালিয়ে মিঃ গাঙ্গুলীকে ওপরে নিয়ে যাব। তুমি কি বল?
মিঃ চাচা জবাব দিলেন—ভাল আইডিয়া। এতে আমার কোন আপত্তিই নেই।
মিঃ ব্রাউন বললেন—ভেরি গুড্‌।
পক্ষকালের মধ্যেই নাইট-ডিউটি উঠে গেল। হরুদা ওপরে বদলি হ'য়ে গেলেন। একটা দারুণ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরাও বাঁচলাম।

৬

সেদিন ছুটি ছিল।
বিছানা ছেড়ে উঠতেই সাতটা বেজে গেল। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জামাকাপড় পরছি। কোনও খাবারের দোকানে ঢুকে জলযোগ সেরে নিতে হবে।
এমন সময় বিন্দু একটা কাঁচের প্লেটে করে কয়েকখানি লুচি, আলুর তরকারী এবং কিছু মিষ্টি নিয়ে হাজির। এসে সলজ্জ হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বলল—মা পাঠিয়ে দিলেন। এগুলো খেয়ে নিন। আমি চা নিয়ে আসছি।
আমার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সত্যি বলতে কি, বাইরে জলযোগ করতে গিয়ে খানিকটা সময় অপব্যয় করার ইচ্ছে ছিল না। ঘরে একপিস্‌ পাউরুটি থাকলেও চলে যেত। বিন্দুর এইভাবে আসাটা যদিও অপ্রত্যাশিত, তবু মনে মনে খুশীই হলাম। মাসীমার ঘরে বনস্পতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঘিয়ে ভাজা লুচির গন্ধ ভুর ভুর করছে ঘরে। ক্ষিধেটা চনমনে হয়ে উঠল।

তবু অবাক হবার ভান ক'রে বললাম—কী সৌভাগ্য, কার মুখ দেখে উঠেছি আজ, যার অস্তিত্বের বিন্দুবিসর্গ টের পাই নি এতদিন, সেই বিন্দু কিনা সশরীরে অন্নপূর্ণা মূর্তিতে ভিখারীর দ্বারে উপস্থিত ?

প্লেটখানা টেবিলের ওপর নামিয়ে বিন্দু বলল—অন্নপূর্ণা যে ভিখারীকে অন্ন দিয়েছিল, জানেন সে কে ?

আমি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ ক'রে বলি—অন্নপূর্ণা দেন শিবেরে অন্ন, অন্ন খান শিব সুখ সম্পন্ন। জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শিব ভাবেতে ঢলিয়া।

বিন্দু বেশ একটু শাসনের সুরে বলল—থামুন, থামুন—তাহ'লে জানেন যে সেই ভিখারী স্বয়ং শিব। আমাকে অন্নপূর্ণা আর নিজেকে ভিখারী বলে তুলনা করলে সম্পর্কটা কি দাঁড়ায় ভেবে দেখেছেন ? অথচ আপনাকে নিজের দাদার মতই ভাবি। সেই ভেবেই এসেছি ; মা বললেন—সত্য আমাদের ছেলের মত, তাকে আবার লজ্জা কিসের ? যাই—মাকে গিয়ে বলিগে আপনার কথা।

আমি প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলাম—তুমি কিছু মনে করো না বিন্দু, অত ভেবে-চিন্তে কথাটা বলি নি ; এমন বাচালতা করা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ ; তবু কেন যে ক'রে বসলাম সেইটাই আশ্চর্য। তুমি আমার বোনের মত ; স্বীকার করছি, কথাটা বলা ঠিক হয় নি তোমাকে।

বিন্দু বলল—যাকগে, যা হ'য়ে গেছে, তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। খেতে বসুন সত্যদা, আমি চা নিয়ে আসছি।

বিন্দু সহাস্যে চলে গেল। আমি কিন্তু খেতে বসতে পারলাম না। মনের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ ধূমায়িত হ'ল। কে আসতে বলেছিল বিন্দুকে ? খাবারের থালা নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল তার ? সত্যিই কি আমি বাচালতা করেছি কিছু ? না, এমন কিছু অন্যায় কথা বলি নি। বিন্দু সেটাকে এমন গুরুত্ব দিয়ে বসল কেন ?

বিন্দুকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। আমাকে দাদার মত মনে করেই সে সাহস ক'রে আসতে পেরেছে, এসে নিঃসঙ্কোচে কথা বলেছে। কিন্তু

ঐ কথাটা মুখে বলার কি প্রয়োজন ছিল ? আমি যে এতদিন ভাড়াটে হিসেবে তাদের বাড়ীতে রয়েছি, কোনদিন মুখ তুলে তাকিয়েছি ওদের দিকে ? মাসীমা বিন্দুর বৌদি, বিন্দু সেকথা ভাল করেই জানে। বিন্দু এজন্যে কি আহত হ'য়েছে মনে মনে ? হয়ত অপমানিত বোধ করেছে নিজেকে। ভেবেছে রূপের জৌলুষ নেই বলেই হয়ত আমি ওর দিকে চেয়েই দেখি না। ও যদি সুন্দরী হত, তাহ'লে কি আমার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ থাকত ?

নিজের সম্বন্ধে সমালোচনা হয়ত ঠিকই করেছি, কিন্তু বিন্দুর সম্বন্ধে যা ভেবেছি তা ভুল। বিন্দু আমাকে দাদার মতই মনে করে, সে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা ক'রে গেল এইমাত্র।

কতক্ষণ চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলাম জানি না ; বিন্দুকে চা নিয়ে আসতে দেখে হুঁস হল।

বিন্দু এসে অবাক হ'য়ে বলল—ওমা ! এখনো হাতই দেন নি ? বসে বসেই ভাবছেন বুঝি কথাটা নিয়ে ? আচ্ছা মানুষ আপনি সত্যদা ! নিন, খেয়ে নিন—

আমি অপ্রস্তুত হয়েই বলি—চায়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম—আমার আবার তুটোই একসঙ্গে চলে—

বিন্দু বলল—ও, তাতো জানতাম না। জানা থাকলে একসঙ্গেই আনতাম।

আমি খেতে খেতে বলি,—এগুলো ধুয়ে দিয়ে আসব, তোমাকে আর আটকে রাখতে চাই না।

বিন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরে চাইল আমার দিকে। তারপর বলল—আচ্ছা।

বেরিয়ে যেতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বিন্দু। কার উদ্দেশ্যে যেন তাকে বলতে শুনলাম—কি চান ?

নারীকণ্ঠের উত্তর শুনতে পেলাম—সত্যবাবুর কাছে একটা দরকারে এসেছি। উনি আছেন ?

বিন্দু উত্তর দিল—আছেন, আসুন।

ঘরে প্রবেশ করল ছবি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু চলে গেল। খেতে খেতেই বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি—কি খবর?

ছবি বলল —আপনার খাওয়া হ'ক বলছি।

ছবি দাঁড়িয়েছিল, ঘরের চারিদিক দেখছিল চেয়ে চেয়ে। তাকে চৌকিতে বসতে বললাম। ছবি আদেশ অমান্য করল না। জলযোগ সেরে নিয়ে বললাম—বল, কি বলবে।

ছবি কোনও সঙ্কোচ না ক'রে বলল,—পরীক্ষা দেব, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কাছে দেখিয়ে শুনিয়ে নেবার ইচ্ছে—বিশেষ করে ইংরেজী আর অঙ্কটা।

আমি সহাস্যে বলি—তুমি বুঝি আর লোক পেলে না?

ছবি সঙ্গে সঙ্গে বলল—লোকের অভাব নেই, কিন্তু—

—বল, থামলে কেন?

—আমি তো পয়সা দিতে পারব না। তেমন সাধ্য নেই।

—ও আচ্ছা, আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেব, এখানে নয়—তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে।

ছবি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কষ্ট করে যাবেন আমাদের বাড়ী?

আমি সহাস্যে জবাব দিলাম—হ্যাঁ যাব।

ছবি একটু পরে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—কবে থেকে যাবেন? —কাল থেকেই যাব। তবে প্রত্যেক সপ্তাহে যাওয়ার সময় বদলাতে পারে। বিকেলে ডিউটি পড়লে সকালের দিকেই যেতে হবে।

—ঠিক আছে। আমি তাহ'লে চলি?

—হ্যাঁ, এসো।

ছবি চলে যেতেই প্লেট আর কাপডিস ধোবার জন্যে উঠলাম। ঘরের বিশ্রী অবস্থা দেখে বিন্দু আর ছবি কি ভাবল কে জানে। এগুলো

পৌঁছে দিয়ে এসে ঘর-দোর ঝাঁট দিতে হবে। কিছু কাচাকাচি করতে হবে। তারপর স্নান সেরে খেতে যেতে হবে মেসে।

বিকেলের দিকে রায়-ষ্টুডিওতে গিয়ে দেখি, অসিতদা তাঁর অন্ধকার ঘরে অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের তোলা কিছু নেগেটিভ প্রিন্টিংয়ে ব্যস্ত।

আমি ডাক হাঁক করতেই অসিতদা ভেতর থেকেই বললেন—চায়ের অর্ডার দিয়ে ব'সো চুপ ক'রে। বড্ড ব্যস্ত, ডিসটার্ব ক'রো না।

আমি রাগ করে বললাম—ও সব ছেড়ে আসুন তো, চা খেয়ে তারপর আবার গিয়ে বসবেন।

অসিতদা সত্যিই এ্যাপ্রণ-পরিহিত অবস্থায় বের হ'য়ে এলেন অন্ধকার ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলেন—চায়ের অর্ডার দেওয়া হ'য়েছে?

—হ'য়েছে; বসুন তো! অত খাটেন কেন? এ্যামেচারদের ঝামেলা ঘাড়ে না নিলে কি চলে না আপনার?

অসিতদা হাসলেন। টাকে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন—বুঝলে সত্য, এরাই হল ঘরের লক্ষ্মী। পেশাদার ফটোগ্রাফারদের এক একটা 'ডাল্' সিজন থাকে। বলতে গেলে তখন এদের তোলা ছবির নেগেটিভ ডেভেলপিং, প্রিন্টিং, এনলার্জিং করে ফটোগ্রাফির মালপত্র বিক্রী করেই আমাদের ষ্টুডিও চালাতে হয়।

—যাই বলুন, এগুলো ওদের কেবল সময় আর অর্থের অপব্যয়।

—কি বলছ সত্য, অ্যামেচারদের সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই। শিল্পী বল, লেখক বল, অভিনেতা বল—অ্যামেচারদের কাজে আন্তরিকতা থাকে; দরদ থাকে। আমরা ফটোগ্রাফির কাজ ক'রে পেট চালাই বটে কিন্তু এ বিদ্যেটার প্রকৃত চর্চা করবার আমাদের সময় কোথায়?

—কারণ কি?

—কারণ আমরা অপরের কাজ করি। অপরের পছন্দমত আমাদের ছবি তুলতে হয়, খদ্দের সন্তুষ্ট হ'লেই হ'ল।

—আপনি কি তাহ'লে বলতে চান, ফটোগ্রাফির চর্চা করে একমাত্র এ্যামেচাররাই?

—নিশ্চয়। ওরাই এই আর্ট নিয়ে প্রকৃত সাধনা করে, ছবি তোলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কবিদের, লেখকদের যেমন নিজেদের লেখা নিয়ে হরদম কাটা ছেঁড়া চলে, এরাও তেমনি মনের মত ছবি না হ'লে বার বার চেষ্টা করে। শেষে এটাই তাদের নেশার মত হ'য়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই দেখা গেছে, পৃথিবীতে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে অ্যামেচারদের স্থান পেশাদারদের অনেক ওপরে।

ইতিমধ্যে চা এসে গেল। চা খেতে খেতে বললাম—সে যাকগে। আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি। ছবিকে চেনেন ত?

—যা বাব্বা! ষ্টুডিও চালাই, আর ছবি চিনি না?

হেসে বললাম—কাগজের ছবি নয়, টেম্পল রোডে যাদের বাড়ী, সেই রক্ত মাংসের ছবিকে?

অসিতদা বললেন—তাকে আবার চিনি না? চিনি বইকি। এই তো সেদিন ওর পাশপোর্ট সাইজের ফটো তুলে দিলাম। পরীক্ষা দেবে এবার। মেয়েটা খুব ষ্ট্রাগল করছে। মা নেই, বাবা রুগ্ন। দু'ভাই ছোট। সংসারের কাজ-কর্ম নিজে করে। বাবার সেবা, ভাইদের দেখাশোনা, রান্নাবাড়া সেরে তবে পড়াশুনো। বাহাতুর মেয়ে বটে!

—কেমন ক'রে ওদের চলে?

—ওর বাবার পেনসনের টাকা কটাই সম্বল। বুড়ো চোখ বুজলে মুস্কিল হবে।

আমি বললাম—অসিতদা, ছবি আজ আমার কাছে এসেছিল। ওকে পড়াশুনা দেখিয়ে সাহায্য করার কথা বলতে।

অসিতদা জিজ্ঞাসা করলেন—রাজী হ'য়েছ তুমি?

—হ্যাঁ হয়েছি।

—খুব ভাল করেছ। ও নিজে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একজন কেউ না ধরলে দাঁড়ানো শক্ত। তোমার মামা না থাকলে তুমি কি লেখাপড়া করার সুযোগ পেতে জীবনে? প্রথম প্রথম বাইরে থেকে একটা অবলম্বনের দরকার হয়। দাঁড়াতে শিখলে আর তার দরকার হয় না। শুনে সুখী হলাম ভাই। দু'পাঁচটি ছেলেমেয়েকেও যদি দাঁড় করাতে পারো, দেখবে জীবনে অনেকখানি সান্ত্বনা পাবে। তুমি ব'স, আমি হাতের কাজটুকু সেরে ফেলি।

ব'লে হন্তদন্ত হ'য়ে অসিতদা ঢুকে গেলেন অন্ধকার কক্ষে।

বেশ কদিন তাগাদা দেবার পর মিঃ দত্তর কাছ থেকে নোটবুকখানা আদায় ক'রেছি। বনস্পতি শিল্প সম্পর্কে কিছু দরকারী কথা তাঁর মুখে শুনেছি। বলতে বলতে বোধ হয় হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তিনি। অনন্যোপায় হয়ে ফাঁস করেছিলেন গোপন কথা। বিভিন্ন জার্নাল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করার কথা। নোটবই খানা আমার হাতে দিয়ে বলেছেন—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দিচ্ছি, দেখবেন, না হারায়। আপনাকে বিশ্বাস নেই।

আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে নোটবুকখানা নিয়ে চলে এসেছি তাঁর কাছ থেকে। রাত্রে পড়তে আরম্ভ করেছি গভীর আগ্রহ নিয়ে। পড়ে জেনেছি অনেক কিছু। বনস্পতির ঠিকুজি-কুষ্ঠি জানবার যে কৌতূহল হয়েছিল, তার অনেকখানি মিটেছে মিঃ দত্তের নোট-বইখানা প'ড়ে।

ইংরেজীতেই নোট নিয়েছিলেন মিঃ দত্ত। ভাষান্তরিত হ'লে সেটা মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়ঃ

মার্গারাইনের আবিষ্কারক একজন ফরাসী। প্রথমতঃ ফ্রান্স্ থেকেই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ ক'রে ডাচ্‌দেশীয় মাখন ব্যবসায়ীরা এই শিল্পের উন্নতিবিধান করে। ব্রিটিশদের জন্যেই মার্গারাইন উৎপন্ন

হ'ত ; পরে জার্মানরাও এই পদার্থটি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়। এ সব কিছুই সম্ভব হ'ত না, যদি ডাচ্ মাখন ব্যবসায়ীরা তাঁদের বহু দিন প্রচলিত মাখন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্রিটিশদের অবস্থা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকতো।

এ ছাড়াও মার্গারাইন শিল্প এমন দ্রুত উন্নতিলাভ করতে পেরেছে, তার কারণ পরিবহনের উন্নতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রটারড্যাম্ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হ'য়েছিল। রটারড্যাম্ বন্দর দিয়েই জলপথে এবং স্থলপথে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল আসত আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশ থেকে।

আঠারো'শ সত্তর সালের পর থেকেই ব্যবসায় প্রসারের হার বেড়ে গেছে এবং শিল্পের পদক্ষেপ দৃঢ় হ'য়েছে। নেপোলিয়নের যুদ্ধোত্তর কালে সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, যন্ত্রশিল্প এবং পরিবহনে যে পরিবর্তন সূচিত হ'য়েছিল, সেটাই হ'ল মার্গারাইন শিল্পের সমৃদ্ধির কারণ। নেদারল্যাণ্ড মাখন ব্যবসাতে পূর্ণ স্বাবলম্বী ছিল। নানা কারণে মাখনের উৎপাদন ব্যাহত হ'লে মাখন শিল্পের অনুকরণেই সেখানে প্রচলন হয় মার্গারাইন শিল্পের।

অতএব মার্গারাইন শিল্পের বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এর পূর্ববর্তী মাখন শিল্পের কথা কিছু কিছু জানা দরকার।

এরপর নোট করা হ'য়েছে এ্যাংলো-ডাচ্ বাটার্ ট্রেডের প্রসঙ্গ। মিঃ দত্তর হাতের লেখা মুক্তোর মত। পড়তে আমায় এতটুকু বেগ পেতে হয় নি। মিঃ দত্ত লিখে গেছেন :

কয়েক শতাব্দী ধরেই ডাচ্দেশীয় মাখন ব্রিটেনে সুপরিচিত। এলিজাবেথের আমলে ডাচ্দেশের লোককে দেখলেই যে কোন ইংরেজ সম্বোধন করত 'বাটার-বক্স' ব'লে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠে। সেখানে অষ্টাদশ শতকে দরিদ্র

জনসাধারণের পেট যতখানি ভরা থাকত, এক শতাব্দী পরের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই সময়ে দারিদ্র চরমে উঠেছিল ; কেউ কেউ অনাহারে দিন কাটাত। দরিদ্রদের মধ্যে যাদের আহার জুটত তারা খেত প্রধানতঃ আলু আর পাউরুটি। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্য-বিত্তদের কথা আলাদা। এই সময়ে নতুন নতুন শিল্পের প্রসার এবং তা থেকে প্রচুর মুনাফার ফলে তাঁদের মধ্যে আমদানীকৃত খাদ্যের চাহিদা দেখা দিয়েছিল ; এর মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ডাচ্‌দেশের মাখনই বেশী। ডাচ্‌দেশের দুই পরিবার মাখন ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁরা হ'লেন—এ্যান্টন জার্জেনস এবং প্রতিযোগী ভ্যানডেন-বার্গের প্রতিষ্ঠান।

নর্থ ব্রাবাস্টের অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহর অস্‌। এই দুই পরিবার সেই শহরেরই অধিবাসী। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখা গেছে, অসের খ্যাতির কারণ তার চারপাশের জায়গাগুলো ; মাখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের পক্ষে তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চতুষ্পার্শে বিস্তৃত, উর্বর যোজনের পর যোজন বিস্তৃত পশুচারণ ক্ষেত্র থাকার জন্যে গবাদি পশুসম্পদ ছিল যথেষ্ট। এই কারণে প্রচুর পরিমাণে মাখন উৎপন্ন হ'ত এই সব জায়গায়। অসে সেই মাখন এনে জড়ো করা হ'তো ; এইভাবেই এখানে মাখন ব্যবসায়ের সূত্রপাত।

এ্যান্টন জার্জেনস্‌ এবং তার প্রতিযোগী ভ্যানডেনবার্গের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই ব্যবসায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। রটারড্যাম্‌ হ'য়ে ওঠে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বন্দর। মাখন ব্যবসায়ে নিযুক্ত উপরোক্ত দুই পরিবার ছিলেন ভিন্ন মতাবলম্বী। জার্জেনস্‌ পরিবার ছিলেন রোমান ক্যাথলিক আর ভ্যানডেন বার্গ পরিবার ছিলেন ইহুদী।

ইংরেজদের মাখন প্রীতির কথা সুবিদিত। খাদ্যের ব্যাপারে ইংলণ্ড

অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের দেশে মাখনের উৎপাদন যৎসামান্য। প্রয়োজনের তুলনায় তা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। কাজেই মাখনের ক্ষুধা তাদের অতৃপ্ত থেকেই যায়।

যেটুকুও বা মাখন ইংলণ্ডে উৎপন্ন হ'ত, এক প্রাকৃতিক উৎপাতের ফলে তাও বন্ধ হ'য়ে গেল। সেটা ১৮৬৫ সাল। ইংলণ্ডে প্লেগের ফলে ভয়াবহ গো-মড়ক দেখা দিল। এই সময়ে ব্রিটেনে এক পাউণ্ড মাখনের দাম ছিল তুই শিলিং। সমাজের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া এই বস্তুটি আর সকলের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ছিল। কিন্তু অল্পবিত্ত অবশিষ্ট মানুষরা কি খাবে তাহ'লে?

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে আলোচনা হ'য়েছিল যথেষ্ট। 'সোসাইটি অব আর্টস' পত্রিকায় রেকর্ড করা হয়েছিল, মাখনের উচ্চমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পমূল্যের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সত্যিই ভেবে দেখা দরকার।

দরিদ্র শিশুদের একমাত্র খাদ্য পাউরুটি। তাদের চার ভাগের তিন ভাগই সাপ্তাহিক একুশবারের খাবারের মধ্যে সতের বারই পাউরুটি ব্যবহার করত। উচ্চমূল্যে মাখন কিনে খাবার মত ইংলণ্ডের পাউরুটি শ্রমিকদের উপার্জন ছিল না। তারা তাদের একমাত্র প্রধান খাদ্য পাউরুটি খাওয়ার একঘেয়েমি দূর করত সিরাপ অথবা ঝোলা গুড় দিয়ে। এর ফলে শ্রমিকদের খাদ্যে স্নেহপদার্থের অভাব থেকে যেত।

এই অবস্থার প্রতিকারে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছিল ফ্রান্সে। ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে হাতে-কলমে কোন পরীক্ষাতে কোন উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যায় নি।

তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রসায়নবিদ্‌দের এক প্রতি-যোগিতায় আহ্বান জানালেন। উদ্দেশ্য—মাখনের মত কিন্তু অত্যন্ত সুলভ এক বিকল্প পদার্থ আবিষ্কার। তৃতীয় নেপোলিয়নের এই ধরণের প্রতিযোগিতা আহ্বানের সঠিক কি উদ্দেশ্য ছিল? শ্রমিক শ্রেণীর

কল্যাণই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না ফরাসী সৈন্যের জন্যে সস্তায় খাদ্যের যোগান দেওয়াই ছিল তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য, একথা সঠিক বোঝা যায় না।

সে যাই হোক, এতে মস্ত একটা উপকার হ'ল, শুধু ফ্রান্সের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের। আবিষ্কৃত হল মাখনের বিকল্প সুলভ স্নেহ-পদার্থ। যে ফরাসী রাসায়নিক এই অসাধ্য সাধন করলেন, তাঁর নাম মিগি মোরিস।

মিগি মোরিসের আবিষ্কার সম্বন্ধে মিঃ দত্ত যা নোট করেছেন, এখানে তাই হুবহু তুলে দিচ্ছি :

He (Mige Mouries) argued that liquid partieles passing through the kidneys of milking cows and subsequently through the udders were turned into milk containing butter : and he concluded that by treating the fat in which the kidneys were enveloped and by adding udders in a sliced form he would obtain a substitute for butter. The kidney fat was to be treated by melting it and cleaning the melted fat with rough salt : the salt would sink to the bottom of the vat, taking the dirt and fibre with it. Then the purified fat was to be allowed to solidify to the point at which it became granulated : The resulting substance which was called 'premier Jus.' The premier Jus was pressed in a thin cloth, the harp substance remaining in the cloth being 'stearine', the oil discharged being 'obo' : It was this obes which formed the basis of the butter substitute.

মিগি মোরিস এই ফরমূলা আবিষ্কার ক'রে শিল্পের ইতিহাসে নিজের স্থান ক'রে নিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কো জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে তৃতীয় নেপোলিয়নের সমাজ উন্নয়ন কিংবা সামরিক মিতব্যয়ের কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ফরমূলা আবিষ্কৃত হ'ল। বাকী রইল মিগি মোরিসের আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনাকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগানো। ফ্রান্স এবং ব্রিটেন একে কাজে লাগায়নি। ফ্রান্সের পরাজয়, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনাবলী শিল্প প্রচেষ্টার অনুপযোগী ছিল। ফ্রান্সের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর।

অপরদিকে খাদ্যে ব্রিটেনের পরমুখাপেক্ষিতার স্বভাব সেই দেশকে এই সুলভ বিকল্প খাদ্যের উৎপাদনে উৎসাহিত করে নি। সেই কাজে এগিয়ে এল হল্যাণ্ড তার মাখন উৎপাদনের বিপুল অভিজ্ঞতা এবং শিল্পের উপযোগী সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা নিয়ে। জার্জেনস্ এবং ভ্যানডেনবার্গ প্রতিষ্ঠান দুইটি এই স্নেহপদার্থ উৎপাদনের পথিকৃৎ।

মিঃ দত্তের নোটবুকের আরও কয়েকটি পাতা অবশিষ্ট ছিল। ঘুম পেয়েছিল বলে আর পড়তে পারা গেল না। ভাবলাম, আর এক সময় এটুকু শেষ করলেই চলবে।

পার্বতী-বৌদিকে হরুদার সঙ্গে প্রথম দেখি রেলওয়ে ষ্টেশনে। তখনো তিনি বউদি হন নি। পরে জেনেছি, তিনি নিশাদির বোন। উচ্চ-শিক্ষিতা। ফিলজফিতে এম. এ.।

আমিও সেদিন কলকাতা যাচ্ছিলাম। হরুদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম —কোথায় যাবেন?

হরুদার পাশেই এক মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে হরুদা বললেন—একে কলকাতা পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

মহিলার দিকে চেয়ে দেখলাম। চওড়া কপাল, গোলগাল মুখখানা। দেখে চোখে লাগে না। পরণে একখানা সাদা শাড়ী। দু'হাতে একটি

ক'রে সোনার বালা। বাঁ হাতে রিষ্টওয়াচ। মহিলাকে দেখে খুব সাদাসিধা বলেই মনে হ'ল।

এঁকে এর আগে কোনদিন দেখি নি। হরুদার সঙ্গে কি তাঁর সম্পর্ক, সেদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

একই কামরায় উঠেছিলাম আমরা। হরুদা আর আমি পাশাপাশি বসলাম। মহিলা সামনে বসলেন।

হরুদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম, মহিলা একমনে ষ্টেটসম্যান পত্রিকা পড়ছেন। এবার আমি একটু অবাক হলাম।

হরুদা বড়লোক। সত্যি বলতে কী, তাঁর সঙ্গে মহিলাকে দেখে মনে মনে অশিক্ষিতা, গ্রাম্য পরিচারিকা শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছি। ভেবেছি, হয়ত উনি হরুদার বাড়ীতে পাচিকার কাজ করেন। হয়ত ডায়মণ্ড-হারবার লাইনে বাড়ী; কিম্বা শিয়াখালা লাইনের কোনও গ্রামে। হরুদা তাকে শিয়ালদা অথবা হাওড়া ষ্টেশনে তুলে দিতে যাচ্ছেন। তাঁকে নিবিষ্ট মনে ষ্টেটস্‌ম্যান পড়তে দেখে আমার ভুল ধরা পড়ল।

সারাপথ একটি কথাও বলেন নি মহিলা। হরুদার পরিচিত অপর ব্যক্তির উপস্থিতিতে এমন শিক্ষিতা মহিলার যে সঙ্কোচ থাকার কথা নয়। তাহলে কি হরুদার সঙ্গে ওঁর আলাপও এমন বেশী কিছু নয়? হয়ত কারও অনুরোধ ঠেলতে' না পেরে এঁকে পৌঁছে দিতে চলেছেন। হরুদাও আগে হয়ত এঁকে চোখেই দেখেন নি।

মনের মধ্যে এই সব কথা তোলপাড় করছিল। কিন্তু হরুদাকে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

শিয়ালদা পৌঁছে আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম। চিন্তাটা কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। কে এই মহিলা? এরকম গাম্ভীর্য নিয়ে একমাত্র বিদ্যালয়ের গুরুমশায়দের দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। ইনি কি তা'হলে কোনও বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী?

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, আমার এক একটা অনুমান কেমন সত্যি হয়ে যায়। কদিন আগের কথা। একটা ঠাকুরদের বই এসেছিল

সিনেমায়। মাসীমা আর বিন্দুকে নিয়ে দেখতে গেলাম। আসলে একটা সিনেমা দেখানোর ইচ্ছে হয়েছিল বিন্দুকে। ঠাকুরদের বইয়ের আকর্ষণে মাসীমা আমার অনুরোধে যেতে রাজী হলেন। আর বিন্দুর যাওয়ার কথাটা কৌশলে তাঁকে দিয়েই বলালুম। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

ট্রেনে ক'রে ফেরার সময় খালি কম্পার্টমেণ্টে চেপেছি। প্ল্যাটফর্মের অপর দিকে দরজার কাছে ছুটো বছর দশ-বারো বয়সের ছেলে বসে। দেখে মনে হল, ট্রেনে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। অতটা গ্রাহ্য করি নি; বসে আছে, থাকুক।

আমরা গিয়ে ওধারে বসলাম। নতুন জুতো জোড়া খুলে ফাঁকা বেঞ্চির উপর পা তুলে নাচাতে নাচাতে বিন্দু আর মাসীমার সঙ্গে গল্পে মশগুল। মাঝে একটা ষ্টেশন। ট্রেন থেমে কখন ছেড়েছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি, সেই ছেলে ছুটো নেই। ষ্টেশনে নেমে গেছে। আর সেই মুহূর্তে নীচের দিকে না চেয়েই অনুমান করে বসলাম, আমার নতুন জুতো জোড়া না থাকারই কথা। দেখলাম, ঠিক তাই।

সঙ্গে সঙ্গে খেদোক্তি করে উঠলাম—যাঃ!

মাসীমা বললেন—কি হল?

বিন্দু উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করল—কি হল সত্যদা?

শুষ্কস্বরে বললাম—ছেলেছুটোকে তখন বসতে দেখে ভাবতেই পারিনি, জুতো চুরির মতলবে ওখানে বসে আছে। যেই দেখেছি দরজার কাছে ওরা নেই, তখনই খেয়াল হয়েছে আমার জুতোও নেই তাহ'লে। দেখি ঠিক তাই।

মাসীমা বললেন—দেখ দিকিনি, মুখপোড়াদের কি কাণ্ড!

বিন্দু ছুঃখ করে বলল—আমাদের জন্মেই হ'ল। আমাদের সিনেমা দেখানোর কথা আপনার চিরকাল মনে থাকবে সত্যদা, কি বলুন?

হরুদার সঙ্গে সেই মহিলাকে দেখে প্রথমবার ভুল করেছিলাম। পরের অনুমান ঠিক হয়েছিল। সেকথা পরে জেনেছি।

এখানে চাকরীতে ঢোকার আগে বি. কম. ক্লাসে হরুদা ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কলেজ করা তাঁর মতো লোকের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। মিঃ ব্রাউন রীতিমত তাগাদা দেওয়াতে তিনি পরীক্ষাটা প্রাইভেটে দিতে মনস্থির করলেন। অফিসে বই আনতেন পড়বেন ব'লে। জিজ্ঞাসা করতাম—কেমন তৈরী হচ্ছে?

হরুদা জবাব দিলেন—এক লাইনও পড়া হয়নি।

অবাক হয়ে বলি—সে কি! অফিসে তাহলে বই আনেন কি জন্যে?

হরুদা রসিকতা করেন—রাত্রে মাথায় দিয়ে শোবার জন্যে। বই-গুলোর সাইজ এক একটা বালিসের মত। দিব্যি ঘুম হয়।

যে কদিন টাইম-অফিসে ছিলেন, সে সময় তবু বই মাথায় দিয়েছিলেন; ওপরে বদলি হয়ে যাবার পর সে বই টাইম-অফিসের ড্রয়ারেই র'য়ে গেল। অথচ তাঁর পরীক্ষা তখন আসন্ন।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি—পরীক্ষা দেবেন তো?

—নিশ্চয়ই।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকাই। মনে মনে বিরক্তি বোধ করি। পরীক্ষা দিতে হ'লে বই-এর সঙ্গে একটু আধটু সম্পর্ক রাখা দরকার। মানলাম, ওর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। আমাদের মত গবেট নন। কিন্তু ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে না পড়ে বি. কম. পাশ করেছে, এমন কথা তো শুনি নি। বইয়ের সঙ্গে এই রকম নিঃসম্পর্ক ছিলেন বলেই তাঁকে আই. এস. সিতে কম্পার্টমেণ্টাল পেতে হয়েছিল।

এ সব ভেবে আবার লজ্জিতও হলাম একটু। আমি বি. কম. পাশ করেছি, হরুদা করেন নি, এই কমপ্লেক্সে ভুগেই কি ঐ সব ভাবতে আরম্ভ করেছি?

হরুদা ভাবলেন, আমি কিছু বলব তাঁর কথার জবাবে। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন—একটা কথা কদিন ধ'রে কেবলই ভাবছি। কিছুতেই ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না।

—কি ভাবছেন?

বিয়েটা পরীক্ষার আগে করব না পরে?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। হরুদার বিয়ে? কার সঙ্গে? কবে ঠিক হ'ল? একরাশ প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগল। হরুদাকে আমি খুবই সমীহ করি। বয়সে আমার চেয়ে তিনি বছর চারেকের বড় হবেন। তিনি আমার চাকরী ক'রে দিয়েছেন। এই সব কারণে এক ধরণের ভয়মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা বোধ করি। তাই আমার মুখ থেকে একটা প্রশ্নও বার হ'ল না। আমি অবাক চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হরুদা আমার অবস্থাটা অনুমান ক'রে বললেন—তুমি বোধ হয় অবাক হ'য়ে ভাবছ, এ বলে কি! পরীক্ষার মাত্র এক সপ্তাহ বাকী, এখন বিয়ের কথা ভাবছে।

আমি এতক্ষণে মুখে কথা পেলাম—না, সেকথা ভাবছি না। শুধু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে পাত্রীটি কে? ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারছি না।

হরুদা চিন্তায় ফেললেন আমাকে। এই আধা-শহরে হরুদা বহু আলোচিত পুরুষ। সকলেই তাঁর বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কখনো তাঁকে কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখি নি। কারো প্রেমে পড়েছেন, এমন অপবাদও কেউ দেয় নি তাঁকে। অথচ চেহারা তাঁর সত্যিই রোমান্টিক। অঢেল পৈতৃক সম্পত্তি। অট্টালিকা বাড়ী। এই রকম নিষ্কলঙ্ক চাঁদ কোন রাহুর গ্রাসে পড়েছে, কি করে আন্দাজ করব?

রাহুর সঙ্গে তুলনাটাই তখন আমার মনে এল। কেন বলতে পারি না, আমার যেন মনে হল, হরুদা আর পাঁচজনের মত টোপর মাথায় দিয়ে ছাত্‌নাতলায় দাঁড়াবার পাত্র নন। তিনি নিশ্চয়ই বিয়েটাকে একটা নতুন এ্যাডভেঞ্চারের রূপ দেবেন। এই আধা-শহরটিতে তিনি স্থাপন করতে চাইছেন একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। হয়তো প্রেম-ঘটিত বিবাহের; অসবর্ণ হওয়াও বিচিত্র নয়।

এ সব কথা মনে হ'ল সত্য। কিন্তু মহিলাটি কে। কোনমতেই আন্দাজ করতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বললাম—না, পারলাম না। কে বলুন তো?

হরুদা মৃদু হাসলেন। মনে হ'ল, আমাকে রহস্যের মধ্যে ফেলে রেখে তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করছেন। বলি বলি করেও কিছুক্ষণ মুখ খুললেন না তিনি।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন—সেদিন ট্রেনে একজন মহিলাকে দেখেছিলে আমার সঙ্গে যেতে, মনে আছে?

—আছে।

—তাকেই বিয়ে করছি।

আমি আর একবার অবাক হ'লাম। বোকার মত বললাম—তাঁকে?

—হ্যাঁ।

—তাঁকে ত ঠিক—

—চিনতে পার নি। পরিচয় দিচ্ছি—নিশাদির বোন, কালেভদ্রে নিশাদির বাড়ীতে আসে। ফিলজফির এম. এ.—গার্লস স্কুলের টীচার, আমার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে নিশাদির ঘরেই। আলাপ এখন এতদূর এগিয়েছে যে বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।

—কিন্তু ওঁরা তো আমাদের স্বজাতি নন—

—হ্যাঁ জানি, ওরা বৈদ্য। আমরা ব্রাহ্মণ; তাতে বিয়েটায় বাধা কোথায়? গীতার ফুটনোটে কি লেখা আছে, বামুন-বদ্যিতে বিয়ে হয় না?

—সে না হয় হ'ল, কিন্তু বিয়েটা পরীক্ষার পর হ'লে হ'ত না? এত কিসের তাড়া আপনার?

—না, আমার তরফ থেকে তেমন তাড়াহুড়ো কিছু নেই; আমার ইচ্ছেটাও তাই যে পরীক্ষার পরই বিয়েটা হ'ক; কিন্তু পার্বতীর ইচ্ছে নয়। সে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

—তাহ'লে তাই হ'ক।

কথাটা আমি ঠিক অন্তর থেকে বলি নি। খানিকটা রাগ করেই ব'লে ফেললাম। বুঝতে কষ্ট হ'ল না। মহিলাটি হরুদার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছেন এরই মধ্যে। নইলে তাঁর ইচ্ছেটা এখন বানের জলে কুটোর মত ভেসে যায়? হরুদার ব্যক্তিত্ব সন্দেহাতীত। মিঃ ব্রাউনের মুখের ওপর কথা বলার যাঁর সাহস থাকতে পারে, তিনি কিনা সেই মহিলার ওপর নিজের জোরটুকু খাটাতে পারলেন না? মেয়েদের কাছে পুরুষদের ব্যক্তিত্ব কি এমনিভাবেই উবে যায় কর্পূরের মতো?

হরুদা কিন্তু কথাটা লুফে নিয়ে বললেন—সেই ভাল। ঝামেলা মিটিয়েই পরীক্ষার হলে গিয়ে বসব।

সেদিন অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে ভাবছিলাম, হরুদার খেয়ালীপনার কথা সবই তাঁর যেন সৃষ্টিছাড়া। যদিও ব্যাপারটি তাঁর ব্যক্তিগত, তবু আমার মনের ভেতরে খুঁত খুঁত করতেই থাকল। হরুদার মত ছেলে সেই মহিলার মধ্যে কি দেখে ভুললেন? তাঁর ডিগ্রী দেখে, তাঁর মোটা উপার্জন দেখে? বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। গ্রাজুয়েট না হয়েও হরুদা অমন এম. এ. পাশ দু' দশটা মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারেন। উপার্জনের পরোয়া তিনি করতে যাবেন কোন্ দুঃখে? তাঁর লাখ লাখ টাকার পৈতৃক সম্পত্তি। বিরাট বাড়ী, পুকুর, আমবাগান, ধানজমি। বাবা জীবিত থাকতেই বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। কোন দায় দায়িত্বই নেই তাঁর মাথার ওপর। তাহ'লে? মহিলাকে আমি খুব কাছে থেকেই দেখেছি। যদি বুঝতাম, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়েছেন হরুদা, যাঁকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তিনি খুব সুন্দরী, তাহলেও কিছুটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু মোটেই তা নন। গড় পড়তা বাংলাদেশের মেয়েরা যে রকম সুন্দরী, তেমন হলেও কথা ছিল। এই মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য হরুদা উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, শুনে কার না আশ্চর্য লাগে? তাও আবার স্বজাতি নয়, রীতিমত অসবর্ণ বিবাহ!

হঠাৎ সেদিনের দৃশ্য মনে পড়ল। অসুস্থা নিশাদিকে দেখতে গিয়েছিলাম। একই লেপের মধ্যে পা ঢুকিয়ে ব'সেছিলেন হরুদা। ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল এতক্ষণে। নিশাদির মাধ্যমেই তাঁর বোনের সঙ্গে হরুদার আলাপ। তিনি নিজের মুখেই সেকথা স্বীকার করেছেন। এরপর মানশ্চক্ষে সবই দেখা হয়ে গেল। আলাপের পরে অনুরাগ। বিবাহের মধ্যে এখন তা পরিণতি পেতে চলেছে।

এতক্ষণে মনটা হালকা হ'ল। হরুদা মহিলার ওপরটা দেখেন নি, দেখেছেন ভেতরটা। সেখানে যে হীরকখণ্ডের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তার খবর আমরা জানব কেমন ক'রে ?

চারটে নাগাদ বাসায় ফিরে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। একবার ইচ্ছে হ'ল, মিঃ দত্তর নোটবুকখানা শেষ ক'রে নিই। মিঃ দত্ত পরিশ্রম করে অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন। কে জানত, আমরা যে বনস্পতির খাবার প্রত্যহ খাচ্ছি, তার ফরমূলা বার করেছিলেন একজন ফরাসী রাসায়নিক। মিগি মোরিস তাঁর নাম।

অবশ্য মিগি মোরিসের আইডিয়ার রূপান্তর ঘটেছে, আমূল পরিবর্তন হয়েছে কাঁচা মালের ; উৎপাদন পদ্ধতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হ'য়েছে ; আর তাই তো স্বাভাবিক। জেমস্ ওয়াট্‌স অথবা আলভা এডিসনের আবিষ্কার কি ক্রমশঃ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় নি ?

কিন্তু আলস্য এমনই পেয়ে বসেছিল যে নোটবুকখানা টেনে নেবার পরিশ্রমটুকু পর্যন্ত করতে মন গেল না। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে পড়ে রইলাম বিছানা আঁকড়ে।

অবেলায় গা এলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকতেই তন্দ্রা এসে গেল। আমি বুঝতেই পারি নি, কখন ধীরে ধীরে উঠোনের রোদ্দুর সরে গেছে পশ্চিমে, বেলা পড়ে এসেছে। বিন্দুর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখি, চা জলখাবার হাতে দাঁড়িয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছে।

বিন্দু সেগুলো টেবিলে নামিয়ে বলল—খেয়ে নিন সত্যদা, অবেলায় ঘুমুলে শরীর খারাপ হবে।

আমি অভিযোগ করলাম—রোজ রোজ কেন এ সব আন, বলত বিন্দু?

—রোজ রোজ আবার কখন আনতে দেখলেন ?

—প্রায়ই তো আনছ।

—বাজে বকবেন না, এনেছি—খেয়ে নিন।

উঠে মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। বিন্দু কাজে লেগে গেল সেই অবসরে। আলনা এবং বিছানা গুছিয়ে বাগিয়ে রাখল। হেলায় ফেলায় ছড়ানো জিনিষপত্র গোছগাছ করল।

আমি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার জন্যে এত কষ্ট কর কেন বলত ?

বিন্দু বলল—কেন, দাদার কাজ কি বোনকে ক'রে দিতে নেই ?

আমি আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ খেতে থাকি।

আমার খাওয়া এবং বিন্দুর গোছগাছ একই সঙ্গে শেষ হ'ল। খালি পাত্রগুলো নিতে নিতে বিন্দু বলল—আপনার ছাত্রী কেমন পড়ছে ?

আমি বিন্দুর মুখের দিকে চেয়ে তার মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করলাম। ছবির সঙ্গে চাক্ষুস দেখা-শোনা হয়েছে তার। ছবি প্রকৃত সুন্দরী। লেখাপড়া শিখছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় ছবি ; এতে বিন্দুর মনের কোণে কোথাও কি কোন ক্ষোভ লুকিয়ে আছে ? সেও কি পড়তে চায় ? নাকি বিনা পয়সায় ছবিকে প্রত্যহ পড়িয়ে আসি, এটা সে ভাল চোখে দেখছে না ?

লোকের মনের কথা পড়া যায় না। বিন্দু যদি সেটাই ভেবে থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না আমার। আমি সংক্ষেপে জবাব দিই—ভালই।

বিন্দু হেসে বলে—ছবি দেখতে বেশ, না ?

—হ্যাঁ, ভালই দেখতে।

—আর আমি ?

—ভালই।

—হ্যাঁ, ভাল না ছাই; বাড়ীতে বুড়িয়ে যাচ্ছি—মা বিয়ের চেষ্টা করতে করতে হয়রাণ হ'য়ে গেল, আমি আবার দেখতে ভাল! আজ বুঝলাম, মন যোগানো কথা বলতে আপনি ওস্তাদ। আপনি সব পারেন, বিশ্বাস নেই আপনাকে—

বলতে বলতে একটা অবরুদ্ধ কান্না যেন তার বুক ঠেলে উঠে আসতে চাইছে, মনে হ'ল। বিন্দু যেন সেই কান্নাটাকে চাপা দেবার জন্যেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি শেভ করে, গা ধুয়ে, জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম ছবিকে পড়াতে যাবার জন্যে। বিন্দুর কথা শুনে মনটা কেমন যেন ভার ভার বোধ হচ্ছিল।

হয়ত সেই কারণেই ছবি সেদিন কয়েকটি ভুলের জন্য খুব বকুনি খেল আমার কাছে। এটা তার কাছে নতুন। 'আসছি'—ব'লে সেও উঠে গিয়েছিল। খুব সম্ভব উদ্‌গত অশ্রু গোপন করতে।

একটু পরেই ফিরে এল ছবি। চোখের পাতা তখনো ভিজে ভিজে। অনুতপ্ত হয়ে বললাম—শিক্ষার্থীর পক্ষে ভুল করাটা যে স্বাভাবিক, শিক্ষকরা এই সত্যটুকু বেমালুম ভুলে যান। এটা যে কতখানি আত্মগ্লানি এনে দেয়,—সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যদিও শিক্ষকতা আমার কোনদিন পেশা ছিল না।

ছবি বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ কথা বলছেন কেন?

—তোমাকে ধমক দিলাম, ধমক খেয়ে আড়ালে গিয়ে খানিকটা কেঁদে এলে, তাই কথাটা বলতে হ'ল।

—কি করে বুঝলেন?

—তোমার চোখের পাতা ভিজে, এটা নিশ্চয়ই আমার দেখার ভুল নয়।

ধরা পড়ে গিয়ে ছবি হেসে ফেলল। বলল—ভুল হ'লে আপনি একশো-বার ধমকাবেন।

আমি সহাস্যে বললাম—ভুল বললে ছবি; ভুল হ'লে এবার থেকে একশোবার সংশোধন ক'রে দেব, ধমক দিয়ে আর ভুলের সংখ্যা বাড়াব না।

মেস থেকে খেয়ে ফিরতে রাত্রি সাড়ে নটা বেজে গেল। শোবার আগে নোটবুকখানায় চোখ বুলুতে লাগলাম:

The new network of communication with Europe to the East and with the U. K. and the new world to the west, gave the margarine industry everything it required both for the manufacture and marketing of its products.

১৮৭৯ সাল। ইউরোপীয় কাঁচামাল (জান্তব চর্বি) সরবরাহে তখন খুবই ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তখন থেকেই উত্তর আমেরিকায় দৃষ্টি দেওয়া হল কাঁচামাল সরবরাহের জন্যে।

চিকাগোর মাংসর কারখানাগুলো থেকে প্যাক করা জান্তব চর্বি সরবরাহ হ'তে লাগল প্রচুর পরিমাণে। তারপর ক্রমশঃ যখন জান্তব চর্বির মূল্য উচ্চগামী হ'য়ে উঠল, তখন সঙ্গতভাবেই প্রয়োজন দেখা দিল অন্য কোনও কাঁচা মাল সংগ্রহের। সেই কারণেই ব্যবহৃত হ'তে সুরু হ'ল ভেষজ তৈল—আর খুব সহজেই প্রথম প্রথম আমেরিকা এবং পরে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভেজিটেবল অয়েল আমদানী হতে লাগল।

এই জায়গাটুকু পড়ে একটি রহস্য আমার কাছে এতদিনে পরিষ্কার হ'ল। মার্গারাইন উৎপাদনের প্রথমপর্বে একমাত্র কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত জন্তুর চর্বি (animal fat)। পরে তার দাম আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় সুলভ ভেজিটেবল অয়েলের দিকে দৃষ্টি পড়ে। হলফ ক'রে বলা যায় না, ভারতে বনস্পতি উৎপাদনে কোনদিনই জন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয় নি। বনস্পতির সঙ্গে এর

ব্যবহারের কথা লোকের মুখে মুখে আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই কারণে। তাই আজও অনেক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলার ধারণা, বনস্পতি তাঁদের অস্পৃশ্য। ঠাকুর দেবতার কাজে অপাংক্তেয়।

শুনলাম, ভারতে বনস্পতির সর্বপ্রথম সোল এজেন্সি নিয়েছিলেন হোসেন কাসেম দাদা। বনস্পতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। একথাও শুনেছি, কলকাতার ডালহৌসি এলাকায় ভ্যানে করে বনস্পতিতে ভাজা লুচি বিনা পয়সায় খাওয়ানো হ'ত লোকদের ; ছুঁৎমার্গী লোকেরা কোনদিনই সেখানে ভীড় জমাতে আসত না সেদিন। শোনা যায়, চায়ের ব্যবহারে মানুষকে অভ্যস্ত করার জন্যে নাকি বিনা পয়সায় চা তৈরী করে খাওয়ানো হ'ত প্রথম প্রথম। এখন চা খায় না, এমন মানুষ সংখ্যায় খুবই অল্প। তেমনি বনস্পতি ব্যবহার করেন না, তাঁদের সংখ্যাও খুব বেশী নয়।

ভয়ানক হাই উঠছিল। বাধ্য হয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তে হ'ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। মাসীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন সত্যি বলছ, চর্বি দিয়ে তৈরী নয় ?

জবাব দিই—না মাসীমা, টিনে লেখা আছে দেখে নেবেন হাইড্রোজিনেটেড্ গ্রাউণ্ডনাট এণ্ড তিল অয়েল উইল ভিটামিন 'এ' এণ্ড 'ডি'—একেবারে খাঁটি জিনিষ—হাতের ছোঁয়া লাগে না টিন ভর্তির সময়—মেসিনপত্র সব অটোমেটিক—মেসিনই সব কাজ করে যাচ্ছে—একেবারে নিখুঁত ভাবে—মানুষ শুধু মেসিন অপারেট করে যাচ্ছে—আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে দেখতে পারেন মাসীমা।

মাসীমা গদ গদ হয়ে বললেন—আমাকে তাহ'লে একটিন এনে দিও সত্য। তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথায় অবিশ্বাস করি কি করে ?

৮

ব্যাপারটা নিয়ে এই আধা-শহরটিতে কম হৈ চৈ হয় নি।

পাড়া প্রতিবেশীর আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল বেচারী নিশাদির ওপর। তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হয়েছিল স্কুল কমিটির কাছে। তাঁকে অবিলম্বে পদচ্যুত করার দাবী জানিয়ে। সই করেছিলে হরুদার আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী।

নিশাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর চেষ্টাতেই হরুদার মত ছেলেকে বাগাতে পেরেছে তাঁর বোন। দেখেছে ছেলেটা দেখতে শুনতে ভাল, খুব বড়লোক, দায় দেনা এক পয়সা নেই, অমনি গেঁথে ফেলেছে। এই ঘটনাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। এর মূলোচ্ছেদ না করলে সমাজ রসাতলে যাবে। অল্প-বয়স্ক তরুণরা উৎসন্নে যেতে থাকবে। গ্রামের সুস্থ নৈতিক আবহাওয়া যদি বজায় রাখতে হয়, তবে নিশাদির মত সর্বনেশে মানুষদের পত্রপাঠ দেশ ছাড়া করা উচিত। এঁর হাতে গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া সুস্থতার লক্ষণ নয়। তাঁব কুশিক্ষার ফলে হয়ত একদিন দেখা যাবে,প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রজাপতির অফিসে পরিণত হয়েছে।

সমাজে সেদিন দেখা দিল প্রচণ্ড আলোড়ন। হরুদার বিয়েকে কেন্দ্র করে সারা গ্রামের মানুষ হু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচীন সংস্কারপন্থীরা একজোট হ'য়ে দাঁড়ালেন সব রকমে বাধা দেবার জন্যে। কিন্তু নবীনদের অমিত শক্তির কাছে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। সংস্কারের আগল খুলে বেরিয়ে এসে হরুদা হ'লেন তরুণদের কাছে হিরো।

গ্রামের তরুণ সমাজ সেদিন সাহসের সঙ্গে হরুদার পেছনে এসে দাঁড়াল। রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে হয়ে অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত

স্থাপন করে সত্য সত্যই তিনি সেদিন গ্রামের তরুণদের একান্ত প্রিয়-পাত্র। প্রাচীন এবং নবীনদের মধ্যে বিবাদের হেতু হরুদা নিশ্চিন্তে গিয়ে বিবাহের শপথ গ্রহণ করলেন রেজেষ্টারী অফিসে। হর-পার্বতী মিলন হল।

বন্যার জল বালির বাঁধ দিয়ে রোধ করা যায় না। তরুণদের উৎসাহে হরুদার বিয়ে নির্বিঘ্নে চুকে গেল। বেশ ঘটা ক'রে প্রীতিভোজ দিলেন হরুদা। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হ'লেন নবীন প্রবীণ সকলেই। কিন্তু উপস্থিত ছিল শুধু মাত্র তরুণেরা। ব্যতিক্রম ছিলেন মিঃ চাচা আর মিঃ মুখার্জী। তবে তাঁরা অফিস ষ্টাফ।

পার্বতী বউদিকে দেখলাম। ষ্টেশনে দেখা সেই মহিলা আর ইনি যেন এক নন। চওড়া কপালে মস্ত বড় সিঁদূরের টিপ, সিঁথি থেকে নেমে এসেছে চেন ব'য়ে টিক্‌লি। পরনে দামী বেনারসী। মাথায় অল্প ঘোমটা দিয়েছেন। কুন্দফুলের একটা মালা গলায়। আর পাঁচজন লজ্জাবতী নববধূর মতই দেখাচ্ছিল। এই অবস্থায় ভালই লাগল পার্বতী বউদিকে।

আমি আর হরুদা পার্বতী বউদিকে অভিনন্দন জানাতে এক দুঃসাধ্য সাধন করলাম। দিস্তেখানেক কাগজ ছিঁড়ে একটা কবিতা লিখলাম কদিন চেষ্টা ক'রে। আর্ট পেপারে ভাল করে সেটা লিখে উপহার দিলাম এক ঝাড় রজনীগন্ধা আর কয়েকটি স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কুঁড়ির সঙ্গে। সে কবিতার কপি আমি হারিয়ে ফেলেছি। ওঁরাও বোধ হয় সেটা যত্ন ক'রে রাখেন নি। হরুদা পরে আমার কাছে চেয়েছিলেন। দিতে পারি নি। শুনেছি, পার্বতী বউদির কবিতাটি ভালো লেগেছিল। এমনকি এমন কথাও নাকি বলেছেন—সত্য ঠাকুরপোর এই একটি কবিতাই আমাদের মিলনের শ্রেষ্ঠ সামাজিক স্বীকৃতি। দলিলের মতই এটা মূল্যবান।

কবিতাটি না পেয়ে আক্ষেপ ক'রেছিলেন পার্বতী বৌদি। সেই অমূল্য দলিলখানা তিনিই কোথায় রেখেছিলেন, আর খুঁজে

পান নি। হরুদার মারফৎ আমার কাছে কপি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। শুনে ভাল লেগেছিল। আমি তা'হলে চেষ্টা করলে লিখতে পারি।

বিয়ের গোলমাল শেষ হতেই হরুদা গিয়ে বসলেন পরীক্ষার হলে। প্রীতিভোজের দিন এক সুযোগে জিজ্ঞাসা করেছি—পরীক্ষা দিচ্ছেন তো?

—এখনও পর্যন্ত তো দেব বলেই ঠিক আছে।

—বিয়ের ঝামেলায় কথাটা ভুলে যাবেন না আবার। বইগুলোয় একটু আধটু চোখ বুলিয়ে নেবেন।

—তুমি জান না, কানাই, বলাই, গন্‌শা এবার বি. কম. পরীক্ষা দিচ্ছে।

—শুনেছি, কি হয়েছে?

—ওরা পালা ক'রে পড়ে বইগুলো। আমি কড়িকাঠের দিকে চিৎপাৎ হ'য়ে চেয়ে চেয়ে বিড়ি ফুঁকি আর শুনে যাই।

—আমি হেসে ফেলি। বলি—ওঁরা নিশ্চয়ই খুব খাটছেন। শুধু শুনে শুনেই আপনি পাশ ক'রে যাবেন ভেবেছেন?

উনি বললেন—তুমি আমার ব্যাপার জানো না—পড়ার চেয়ে শুনেই আমার বেশী কাজ হয়।

এরপর বলার কিছুই ছিল না আমার।

সেদিন মিঃ দত্ত আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—বসুন, কথা আছে।

আমি ভাবলাম, বুঝি নোটবইখানার জন্যে তাগাদা দেবেন। আমি মনে মনে জবাব ঠিক ক'রে এনেছি। জিজ্ঞাসা করলে বলতাম—কাজ হ'লেই ফিরিয়ে দেব, অত তাড়া কিসের।

মিঃ দত্ত হাতের কাজটুকু সেরে নিয়ে বললেন—ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না। আপনাকে শুধু বলছি, কেননা এ ব্যাপারে আপনার মতামত আমার কাজে লাগতে পারে।

আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি—কি ব্যাপার ?

—আমি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

—কেন ?

—আমার স্ত্রী মেন্টাল হসপিটালে। রান্না-বান্না, সংসারের টুকিটাকি কাজ-কর্ম ক'রে পড়াশুনো একেবারেই হ'চ্ছে না ছেলেমেয়েদের। আমি সেই ভোরে বেরিয়ে আসি, ফিরি রাত্রে। বাড়ীতে একজন লোকের দরকার। ভদ্রঘরের একজন শিক্ষিতা মহিলার জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, ছেলেমেয়েদের পড়াবেন, দেখবেন, শুনবেন। ইচ্ছে করলে আমার বাড়ীতেই থাকবেন, নয়ত বাড়ী থেকেই যাতায়াত করবেন ; প্রয়োজন হ'লে ট্রেন ভাড়াও সেক্ষেত্রে আমি বহন করব।

আমি কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি—তারপর ? কখানা দরখাস্ত পেলেন ?

সত্যি বলতে কী, এটা মিঃ দত্তর এক ধরণের পাগলামি বলেই আমার মনে হ'ল। এ রকম উদ্ভট বিজ্ঞাপনে কে সাড়া দেবে ? শিক্ষিতা মহিলাকে একাধারে সেবিকা, পাচিকা এবং শিক্ষয়িত্রী হ'তে হ'বে। কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্না মহিলা আবেদন করবেন ব'লে আমার মনে হয় না। তাঁরা এই বিজ্ঞাপনের পেছনে ভদ্রলোকের মনের অভিপ্রায় কী, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার ক'রে দেখবেন। হয়ত ভাববেন, ভদ্রলোক মৃতদার ; বয়স বেশী, আর বিয়ে করার ঝামেলায় যেতে চান না। ঘরে হয়ত ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে একজন মেয়েছেলে চাইছেন। সোজা কথায়, এও গণিকাবৃত্তির এক ভব্য সংস্করণ। অতএব কোনো মহিলাই আবেদন করবেন না।

কিন্তু আমার কথার জবাব মুখে না দিয়ে মিঃ দত্ত একখানা বড় খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখি, খামখানার ওপরে এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার নাম মুদ্রিত। বক্স নাম্বারটাও দেওয়া রয়েছে খামের ওপরে।

কিছুটা নিরাশ হ'য়েই জিজ্ঞাসা করি—দরখাস্ত এসেছে তাহ'লে?
—এসেছে মানে? এক আধখানা নাকি? এখন সমস্যায় পড়েছি, কাকে রাখি, কাকে ছাঁটি। কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। এগুলো আপনি নিয়ে যান। একজনকে বেছে দিন দিকি। কিন্তু সাবধান, কাউকে দেখাবেন না যেন। ঠাট্টা-ইয়ার্কির জ্বালায় তা'হলে আর এখানে টেঁকা যাবে না।
—আচ্ছা, ঠিক আছে।
খামখানা নিয়ে টাইম-অফিসে ফিরে এলাম। খুবই কৌতূহল হ'ল খুলে দেখি। জানাজানি হ'য়ে যাবার ভয়ে পড়তে সাহস হয় নি। সাড়ে তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা বাসায় এসে বার করলাম দরখাস্তগুলো। গুনে দেখলাম সংখ্যায় তেইশ খানা। একে একে পড়তে লাগলাম সেগুলো। তেইশ খানা দরখাস্তের মধ্যে কুড়িখানাই অযোগ্য বিবেচনায় পুরে রাখলাম খামের মধ্যে। যোগ্যতা সামান্য ব'লে বারম্বার দয়া প্রার্থীনি হয়েছেন এঁরা। বাকী তিনখানার মধ্যে থেকে একটি দরখাস্ত বেছে নেবার জন্যে আর একবার ক'রে পড়লাম।
এক প্রবীণা প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে নির্বাচন করা যেত। কিন্তু তাঁর আবার একটি ছেলে আছে। ছেলেকে নিয়ে তিনি বিজ্ঞাপনকারীর বাড়ীতেই থাকবেন, এই আবেদন জানিয়েছেন। মিঃ দত্তের সে ঝামেলা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখলাম না।
দ্বিতীয় আবেদনকারিণী মধ্যবয়স্কা; ইণ্টারমিডিয়েট পাশ; স্বামী বিকৃতি-মস্তিষ্ক। এই কারণেই ভদ্রগোছের একটি চাকরী নেওয়া তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি নিজের বাড়ী থেকেই যাতায়াত করবেন।
মনে মনে হাসলাম। আবেদনকারিনীকে সর্বাংশে উপযুক্ত মনে হ'ল। মিঃ দত্তর স্ত্রী এবং মহিলার স্বামী বিকৃত-মস্তিষ্ক। উভয়ে উভয়ের দুঃখ বুঝবেন।

এঁকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের আগে তৃতীয় দরখাস্তখানা পড়লাম। আবেদনকারিণীর বয়স তেইশ, গ্র্যাজুয়েট। অপরের আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া করেছেন। আরও পড়তে চান। তেমন সুযোগের অভাব। এই চাকরী পেলে তিনি একজন অভিভাবক পাবেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

অনেক চিন্তা ক'রে এ আবেদনপত্র বাতিল করতে হ'ল। আমার কাছে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াল বয়সটা। তেইশ বছরের অনাত্মীয়া, অবিবাহিতা মহিলা ঘরে থাকলে পুরুষের মাথা বেঠিক হবার সম্ভাবনা।

অতএব যাঁর স্বামী বিকৃত-মস্তিষ্ক, সেই মধ্যবয়স্কা মহিলার আবেদন পত্র গৃহীত হওয়ার জন্য সুপারিশ ক'রে খামখানি পরদিন মিঃ দত্তের হাতে অর্পণ করলাম।

মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন—কি ঠিক করলেন?

আমি বললাম। তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ রূঢ়দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—মহিলা নিজের স্বামীকে পাগল ক'রেছে, আমাকেও পাগল ক'রে দিক, এই বুঝি আপনার ইচ্ছে?

—আপনি কি বৌদিকে তাহ'লে পাগল করেছেন?

—তার মানে? কি বল্‌তে চান আপনি? দেখছি, আস্ত একটি বোকারাম বাঁড়ুয্যে আপনি—কথা বলতে শেখেন নি।

—তা ঠিকই বলেছেন, আমি বোকাই বটে। তবে আপনি এত যে চালাক লোক, সামান্য কথায় এত চটছেন কেন?

—চটব না? এমন ফালতু কথা বললে কার না রাগ হয়?

আমি কঠিন হয়ে বললাম,—আমার মতামত চেয়েছিলেন, জানলাম। এরপর ফাইন্যাল সিলেক্‌সান তো আপনার হাতেই।

একটু থতমত খেয়ে মিঃ দত্ত বললেন—হ্যাঁ, আমার সিলেক্‌সান হয়ে গেছে।

—বেশ ত ভালই। তা'হলে আমাকে মিছিমিছি খাটালেন কেন?

—যাচাই করতে, আমার মতের সঙ্গে অপরের মতটা মেলে কিনা?
আচ্ছা, ব্যাপারটা আমার না হ'য়ে যদি আপনার হ'ত, তাঁহ'লে আপনি কাকে পছন্দ করতেন? আপনি কি তেইশ বছরের ঐ বি. এ. পাশ—

—থাক বুঝেছি মিঃ দত্ত। আমার সিলেকসানে সত্যিই ভুল হয়েছে। মিঃ দত্তকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম তাঁর কাছ থেকে।

টাইম-অফিসে ফিরেই দেখি, 'বি' শিফ্‌টের লোকেরা আসতে শুরু করেছে। বিহারী শ্রমিকরা অনেক আগেই আসে। তারা বয়লারের চিমনীর নীচে ছায়াশীতল ঘাসাচ্ছাদিত লনে শুয়ে থাকে গামছা বিছিয়ে। তিনটে বাজবার দশমিনিট আগে থেকে কার্ড পাঞ্চ সুরু হয় 'বি' শিফ্‌টের লোকেদের। চলে তিনটে অবধি। তারপরই পাঞ্চিং ক্লক আউট করে দিতে হয়। 'এ' শিফ্‌টের লোকেরা তখন ডিউটি শেষ ক'রে যে যার বাড়ী চলে যায় কার্ড পাঞ্চ ক'রে। একই পাঞ্চিং ক্লকে 'ইন' এবং 'আউটের' ব্যবস্থা।

তিনটের আগেই 'বি' শিফ্‌টের লোকেদের পাঞ্চ হ'য়ে গেল। বাকী ছিল তিনজন। কাঁটায় কাঁটায় তিনটেয় আবির্ভাব হ'ল তিন মাস্কেটিয়ার্সের। সুজিত, সুভাষ এবং সুশান্তর। রিফাইনিং, হার্ডেনিং এবং ডিওডরাইজিং এর তিনজন অপারেটর। এদের আসাটা কাঁটায় কাঁটায়, যাওয়াটা অনিয়মিত। পরের শিফ্‌টের লোককে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বেরুতে এদের প্রত্যহ দশ পনের মিনিট দেরী হয়ে যায়।

এরা তিনজনেই মাড়োয়ারী কোম্পানীর আমলের লোক। শুধু এরা কেন, বলতে গেলে কারখানার অর্ধেক লোকই পুরানো কোম্পানীর। শুধু ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল ষ্টাফের ভেতরে অধিকাংশই নতুন।

সুজিত-সুভাষ-সুশান্তরা থাকে ষ্টাফ কোয়াটারে। তিনজনেই অবিবা-

হিত। আগেকার কোম্পানীতেও সুজিত-সুভাষ ছিল ইউনিয়নের পাণ্ডা। এখনকার ইউনিয়নের সেক্রেটারী সুজিতই। খুব ভাল ছেলে। কথাবার্তায় যেমন স্মার্ট, তেমনি উদার অন্তঃকরণ। কারখানায় তার জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশী। সুভাষও ইউনিয়নের কমিটি মেম্বার। শুধু সুশান্ত এ সব ঝামেলার মধ্যে থাকত না। খুবই নিরীহ প্রকৃতির মনে হত তাকে দেখে। ধীর, স্থির, কথাবার্তায় মার্জিত রুচিসম্পন্ন বলে বোধ হয়। চেহারাটাও কার্তিকের মত।

সুজিত-সুভাষ দুজনেরই কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা এবং যখন কথা বলে, মনে হয় চীৎকার করছে। কারখানায় এদের দুজনকে সবচেয়ে ভাল-বেসেছি। কেন জানি না, প্রথম দর্শনেই সুজিতেরও ভালো লেগেছিল আমাকে।

সুজিত আর সুভাষের মুখে শুনেছি, ভারতে বনস্পতি শিল্প প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ চৌধুরী।

ওরা ডাঃ চৌধুরী সম্পর্কে অনেক কথা আমাকে বলেছে। ডাঃ চৌধুরী স্বনামধন্য ব্যক্তি। প্রতিভাবান পুরুষ। প্রকৃত কর্মবীর। ভারতের বনস্পতি শিল্পের ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয়, তাহলে ডাঃ চৌধুরীর নাম প্রথমেই স্মরণ করতে হবে। তাঁকে বাদ দিয়ে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

দোষের ভেতর ডাঃ চৌধুরীর দু'হাতে ছিল দু'রকম শক্তি। এক হাতে তিনি গড়তেন, ভাঙতেন অন্য হাতে। জীবনভোর তিনি শুধু গড়েছেন আর ভেঙ্গেছেন। এই বনস্পতি কারখানা তাঁর উদ্যোগেই স্থাপিত হয়েছিল। মাড়োয়ারী শিল্পপতিরা ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। তারা পয়সা পেলেই খালাস। সব দায়িত্ব ডাঃ চৌধুরীর। জার্মান ইঞ্জিনিয়ার আনিয়ে এই কারখানা গড়লেন তিনি। কয়েক বছর যেতে না যেতেই কারখানা বিকিয়ে দিলেন বিদেশী কোম্পানীর কাছে।

অথচ কারখানা থেকে মুনাফায় কোনদিন ঘাটতি হয় নি।

গড়া আর ভাঙ্গার নেশায় পেয়েছিল ডাঃ চৌধুরীকে। কিন্তু বনস্পতি কারখানাতে এসেই তার শেষ। এই কারখানা হস্তান্তর করার পর বেশীদিন বাঁচেন নি তিনি। বিরাট এক হতাশা বুকে নিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তাঁর জার্মান স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে।

সুজিত-সুভাষের মুখে ছাড়া ছাড়া ঘটনা শুনে মন ভরে নি। পূর্বাপর ঘটনা জানাবার ইচ্ছা হত ডাঃ চৌধুরীর জীবনের। তাঁর সম্পর্কে সঠিক খবর জানাতে পারেন একমাত্র মিঃ শীল। ডাঃ চৌধুরীর জামাতা তিনি। তাঁর হাতেই একরকম গড়া। কাজে মিঃ শীলের জুড়ি মেলা ভার।

মিঃ শীলকে এই ব্যাপারে অনুরোধ করেছি। তাঁর কাছ থেকে কথা বার করা সহজ নয়। তেমন মানুষই নন।

বেঁটে খাটো মানুষ মিঃ শীল। মুখ দিয়ে যেন খই ফুটছে। লোককে আঘাত দিয়ে কথা বলতেই তাঁর আনন্দ। তাঁকে দেখে কেমন ভয় ভয় করত। মনে হত, এ ব্যক্তি লোকের খুঁত ধরবার জন্যেই জন্মেছেন। নাইট ডিউটিতে ঘুমুই বলে রিপোর্ট করবেন বলেছিলেন। সেই থেকেই মনের মধ্যে ভয় ভয় ভাবটা থেকে গিয়েছে। কেন জানি না, তাঁকে দেখেই ডিকেন্সের 'ডেভিড্ কপারফিল্ডের' কথা মনে পড়ে যেত। আত্মজীবনীমূলক ঐ উপন্যাসে ডিকেন্স একটি অদ্ভুত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তার নাম ইউরিয়া হীপ। মিঃ শীলের সঙ্গে ইউরিয়া হীপের কোথায় যেন সাদৃশ্য ছিল।

আমার অনুরোধ শুনে মিঃ শীল প্রশ্ন করেছেন—ডাঃ চৌধুরী সম্পর্কে আপনার জানবার আগ্রহ? কিন্তু কেন?

—তাঁর সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে হয়, তাই। একজন কর্মবীরের জীবনী জানবার জন্যে কার না আগ্রহ হয়?

—কিন্তু তারও তো একটা কারণ থাকে? শুধু শুধু জেনে করবেন কি? আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ধরুন, কিছু লিখব তাঁকে নিয়ে।

—লিখবেন? উঁহু, তাহ'লে একটি কথাও বলবো না।

—একথা বলছেন কেন ?

—লেখবার ক্ষমতা আছে আপনার ? ক'খানা বই লিখেছেন শুনি ? আপনার ক্ষমতা না জেনে কেমন ক'রে তাঁর সম্বন্ধে বলি ? আপনি শিব গড়তে গিয়ে যদি বাঁদর গড়েন তাহ'লে ? না মশাই, মাফ করবেন। ও সব ধাষ্টামো আমার দ্বারা হবে না। আর সে রকম চেষ্টাও করবেন না।

মিঃ শীলের সঙ্গে আমার এই আলাপের কথা সুজিতকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছি। সুজিত শুনে বলল—ডাঃ চৌধুরীর কথা আমরাও জানি কিছু কিছু।

সুভাষ বলল—আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন নি কেন ? মিঃ শীল কতদূর জানেন ? তিনি একটা দিকই দেখেছেন আর শ্রদ্ধা করেছেন তাঁকে। আমরা ভালো-মন্দ দুইই দেখেছি। তাঁকে ভালওবেসেছি আবার শত্রুতাও করেছি তাঁর অন্যায় কাজে বিরেধিতা। ক'রে আমাদের কাছে সব জানতে পারবেন।

অনেক কথা শুনেছি তাদের মুখ থেকে। সময় হ'লেই সেকথা বলব।

যে কথা বলছিলাম। থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ঠিক তিনটেয় এসে হাজির। কার্ড পাঞ্চ ক'রে তিনজনেই আমার টেবিলের সামনে দাঁড়াল মুখ ভর্তি পান চিবুতে চিবুতে।

সুজিত বলল—মিঃ ব্যানার্জী, কারখানায় একটাই বড় রকমের উৎসব হয়, সেটা কি বলুন তো ?

হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে কোন জবাবই দিতে পারলাম না। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম ওদের তিনজনের মুখের দিকে।

সুভাষ বলল—বলতে পারলেন না ত ? কারখানার দুর্গোৎসব কোনটা তা জানেন না বুঝি ?

সুশান্ত বলল—ব্যানার্জী বাবু নিরীহ লোক ; অতশত জানেন না।

সুজিত বলল—যাক্ শুনুন। কারখানার উৎসব হলো বিশ্বকর্মা পুজোয়। বেশ ঘটা ক'রে পুজো করতে হবে ; নতুন কোম্পানীতে এই প্রথম

পূজো। আর মাস তিনেক সময় আছে। ড্রামা করতে হবে। এখন থেকেই প্রস্তুতি চালাতে হবে।

আমি সহাস্যে বলি—এই ব্যাপার? তা বেশ তো!

সুজিত বলল—বেশ তো বলেই খালাস পেয়ে যাবেন ভেবেছেন? শুনুন একটা পূজো কমিটি ইউনিয়ন থেকে তৈরী ক'রে দিচ্ছি, আপনাকে সেক্রেটারী হ'তে হবে।

চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি?

সুভাষ বলল—Yes—আপনি!

সুজিত বলল—আশা করি, আপনাকে সাধাসাধি করতে হবে না।

—কিন্তু এ সব ব্যাপারে আমার কোন আইডিয়া নেই—

—সে আমরা বুঝব। ঝক্কি, ঝামেলা যা পোহাতে হয়, তার জন্যে আমরা আছি। আপনার কোন চিন্তা নেই।

—তা বেশ, আপনাদের কথাই রইল।

—এই ঠিক রইল কিন্তু, কথার নড়চড় না হয়।

ওরা চলে গেল। আমি অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এত লোক থাকতে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? তখন কি ভাবতে পেরে-ছিলাম, কাজটা এতই জটিল। তাহ'লে কি আর এমন ফ্যাসাদে নিজেকে জড়াই?

যেদিন ইনটারভিউ দিতে এসেছিলাম কারখানায়, সেদিন ভিজিটারদের টেবিলে ব'সে থাকতে দেখেছিলাম এক সুদর্শন ভদ্রলোককে। তিনি পরের দিনই ষ্টেনোগ্রাফার কাম সেক্রেটারী হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম সুনীল বোস।

ইতিমধ্যে কোম্পানীর স্পোর্টস ক্লাব গঠিত হল। মিঃ টেম্পল নোটিশ দিলেন সবাইকে দোতলায় অফিসরুমে জড়ো হতে। সাতজন সভ্য নির্বাচন করা হবে স্পোর্টস ক্লাব কমিটির। এছাড়া ম্যানেজমেণ্ট ষ্টাফ থেকে থাকবেন দুজন। ফ্যাক্টরী ম্যানেজার কমিটির চেয়ারম্যান।

সভাতেই উপস্থিত সকলের ভোটে ক্লাবের সেক্রেটারী নির্বাচন হ'ল। প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেন দুজন। মিঃ নটরাজন আর সুনীল বোস। হাত তুলে ভোট দেওয়া হ'ল দুজনকে। মিঃ টেম্পল নিজে গুনলেন কার পক্ষে কজন হাত তুললেন। গনণায় দেখা গেল, দুজন প্রার্থীই সমান সমান ভোট পেয়েছেন। মিঃ টেম্পল তখন কাষ্টিং ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলেন সুনীল বোসকে।

সুনীলবাবুর সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা হয়ে গেল। সেদিন তিনি বললেন চলুন, আজ আপনার বাড়ী বেড়াতে যাব। আপনার মিসেসকে দেখে আসি।

সুনীলবাবু আমার ঘরের খবর জানতেন না। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল। সত্য গোপন করে বললাম—বেশ তো চলুন।

সুনীলবাবুকে নিয়ে আমার বাসায় এলাম। ঘর তালাবন্ধ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—মিসেস বেড়াতে গেছেন বুঝি?

আমি হাসি গোপন করে বলি—সেই রকমই মনে হচ্ছে।

সুনীলবাবুকে ঘরে বসিয়ে এক ছুটে চলে গেলাম খাবারের দোকানে। খাবার নিয়ে ফিরে এসে দেখি, সুনীলবাবু চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই সুনীলবাবু বলেন—আপনার স্ত্রী চা দিয়ে গেলেন, খাচ্ছি। আপনি বুঝি খাবার আনতে গিয়েছিলেন? তা বার করুন, খাওয়া যাক।

খাবার প্লেটে সাজিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। বুঝলাম, বিন্দু আমার আসার শব্দ পেয়ে চা দিয়ে গেছে। আমি মিষ্টি আনতে গেছি বোধ হয় জানতে পারে নি। সুনীলবাবু বিন্দুকে দেখে মিসেস ব্যানার্জী বলে ভেবেছেন। কী আহাম্মক লোকটা! বিবাহিত পুরুষকে না হয় চেনা শক্ত। বিবাহিতা মহিলাকে তো সহজেই চেনবার কথা। কপালে সিঁদুর আছে কি নেই, সেটাও ভদ্রলোক লক্ষ্য করেন নি?

বললাম—নিন, খান।

সুনীলবাবু খেতে খেতে বললেন—আপনার 'চয়েস' নেই।

—কেন ?

—আপনার স্ত্রীতো দেখতে সুন্দরী নয় মোটেই।

এতক্ষণে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙলাম—যে চা নিয়ে এসেছিল, সে আমার স্ত্রী নয় সুনীলবাবু। বাড়ীউলির মেয়ে ; আমার বোনের মত।

—তাই বলুন। আপনার স্ত্রী তাহ'লে—

—না, ওসব আমার নেই মশায়, আমি এখনো বিয়ে থা' করি নি।

—আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক দেখছি। ঘুণাক্ষরে কথাটা বলেন নি।

—আপনার সঙ্গে একটু রসিকতা করলাম, কিছু মনে করবেন না। কথাটা আগেই আপনাকে জানানো উচিত ছিল।

সুনীলবাবু খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে রুমালে হাত-মুখ মুছে বললেন

—মিঃ গাঙ্গুলী শুনলাম বিয়ে করেছেন ?

—হ্যাঁ ;

—ওঁর স্ত্রী এম. এ. পাশ ?

—হ্যাঁ।

—প্রেম ক'রে বিয়ে নিশ্চয় ! গাঙ্গুলী তো গ্র্যাজুয়েটও নয়, তাই না ?

—ঠিকই শুনেছেন। প্রেম ক'রে অসবর্ণ বিয়ে করেছেন। গ্রামে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উনি।

আমার কথায় সুনীলবাবু একটু দম্ভ প্রকাশ ক'রে বললেন—গাঙ্গুলী যা করেছে, পাঁচ বছর আগে আমি তা ক'রে ফেলেছি।

—অর্থাৎ আপনি বিবাহিত ?

—আমি কায়স্থ, আমার স্ত্রী ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমরাও প্রেম ক'রে বিয়ে করেছি।

সুনীলবাবুর সান্নিধ্য মোটেই ভাল লাগছিল না আমার। কতক্ষণে তাঁকে বিদেয় করব, এই কথাই ভাবছিলাম।

তিনি কিন্তু যাবার নাম করেন না। ঝাড়া তিন ঘণ্টা তাঁর ক্লান্তিকর, রুচিবিগর্হিত কথাবার্তা শুনতে শুনতে যখন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি তখন তিনি হাতঘড়ি দেখে বলে উঠলেন—অনেকক্ষণ এসেছি, এবার উঠি।

তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে সোজা চলে গেলাম ছবিকে পড়াতে। গিয়ে দেখি, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে সে আমার প্রতীক্ষা করছে।

৯

মিঃ দত্তর নোটবইখানা কদিন আর আটকে রাখা যায়।

সেদিন ছুটির বার। ঠিক করলাম, সেদিনই ওটা পড়ে শেষ ক'রে ফেলব। আর সামান্যই বাকী :

দৈবাৎই বলতে হয়, ফ্রান্সের রাসায়নিকের কৃত্রিম মাখন আবিষ্কারের সংবাদ হেনরী এবং জন জার্জেনস্ এর কানে গিয়ে পৌঁছয়। সেটা আঠারো'শ একাত্তর সালের বসন্তকাল।

অস শহর থেকে তের মাইল দূরে হার্টোজেনবশ্‌ক শহরে J. & W. Cordeweener নামে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। কর্ডিউইনার ব্রুসেলসে তাঁর আত্মীয়ের অফিসের মাধ্যমে ফ্রান্সে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন। এই আত্মীয়টির নাম জুলিয়াস পিটার। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে পিটারকে মাঝে মাঝে ফ্রান্সে যাতায়াত করতে হত। এই রকম একবার ফ্রান্সে গিয়ে তিনি সেই নতুন আবিষ্কারের কথা শুনতে পান। তৎক্ষণাৎ গিয়ে দেখা করেন মিগি মোরিসের সঙ্গে। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত মাখনের বিকল্প বস্তুটির কিছু নমুনা আনতে ভুললেন না।

জার্জেনসদের মাখন বাণিজ্যের কথা জানা ছিল পিটারের। কাল বিলম্ব না ক'রে পিটার কর্ডিউইনারকে জানালেন জার্জেনসদের সঙ্গে যোগযোগ করতে। স্থির হয়, জন জার্জেন্স, কর্ডিউইনার এবং পিটার একত্রে যুদ্ধ থামলেই প্যারিসে যাবেন এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান করতে। ফ্রাঙ্কফোর্টের শান্তিচুক্তি অনুমোদনের পক্ষকাল পরেই তাঁরা

তিনজন যুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন। পটিনে মিগি মোরিসের ল্যাবরেটরিতে তাঁদের সাক্ষাৎ হ'ল। আলোচনার পর তাঁরা বুঝলেন, আবিষ্কার এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ল্যাবরেটরির পরীক্ষা নিরীক্ষার বাইরে এই আবিষ্কারকে এখনও উজ্জ্বল সম্ভাবনার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হয় নি।

সাক্ষাৎকারীরা মিগি মোরিসের কাছ থেকে সেই ফরমূলার স্বত্ব ক্রয় ক'রে নিলেন ব্যবসায় ভিত্তিতে কাজে লাগাবার জন্যে। লেখকের কাছ থেকে প্রকাশকদের পুস্তকের কপিরাইট কেনার মত। মিগি মোরিস তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জার্জেনসদের জানালেন। তাঁর নিশ্চিত এই ধারণা ছিল যে, এঁরাই তাঁর আবিষ্কারকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন এবং লাগাতে পারবেন মানুষের ব্যবহারে।

এই তিন ঝানু ব্যবসায়ী কৃত্রিম মাখন উৎপাদনের প্রয়োজনীয় তথ্য হস্তগত ক'রে ফিরে গেলেন অসে। প্রথম দিকে মার্গারাইনের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জান্তব চর্বি আমদানী করা হ'ত ফ্রান্স থেকে। কাঁচামাল সংগ্রহের তদারকি কাজে হেনরি জার্জেনসকে প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহ প্যারিসে কাটাতে হ'ত; ১৮৮৮ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

অসে বিকল্প মাখন নিয়ে আরও উন্নত ধরণের গবেষণা চলতে থাকে এবং ক্রমে তা আরও উন্নত এবং সরলীকৃত হয়।

'বাটারাইন' নামে এই বস্তু বাজারে চালু হওয়াটা নিঃসন্দেহে একটি সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক অগ্রগতি সূচিত করে। হেনরী কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বাটারাইনে খাঁটি মাখনের ব্যবহার কষ্টদায়ক এবং ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ছিল। আবার পরীক্ষা চলতে লাগল। 'ওলেও'র সঙ্গে মেশানো হল দুধ দিয়ে মন্থন করা অলিভ অয়েল। এতে বেশ সুফল পাওয়া গেল। এরই ভিত্তিতে উৎপাদিত বাটারাইন সুনাম অর্জন করল বাজারে।

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেখা দিল প্রচুর কাঁচামাল

সরবরাহের। ফ্রান্সের বাজার ঠিক তাল সামলে চলতে পারছিল না। এই সময়েই আমেরিকার জান্তব চর্বির বিপুল সঞ্চয় হল্যাণ্ডের অস্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে লাগল।

এর পর আবিষ্কৃত হয় ঠাণ্ডাঘর (cooling air) ট্রাকে রেফ্রিজারেটরের ফলে বহুদূর দেশে জান্তব চর্বি অবিকৃত অবস্থায় চালান দেওয়া সম্ভব হ'ল। দিনের পর দিন ঠাণ্ডাঘরে জমিয়ে রাখলেও পচনের আশঙ্কা রইল না। ঠাণ্ডাঘরের মধ্যে মাংস রক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে কসাইরা পুরাতন পশুহনন যন্ত্রে সন্তুষ্ট রইল না। তারা নতুন ধরণের যন্ত্র উদ্ভাবন করে দিনে সহস্র সহস্র পশুমুণ্ড কর্তন করতে সক্ষম হল।

এই সব পশুর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল শূকর। তাছাড়া গরু, ছাগল, ভেড়াও ছিল। এই সব জন্তর চর্বিই ছিল বাটারাইনের একমাত্র কাঁচামাল। এই দিয়ে জার্জেনসের পরিচালনায় হল্যাণ্ডের কারখানা থেকে সপ্তাহে প্রায় ছ'শো টন মার্গারাইন উৎপন্ন হত।

১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত হল্যাণ্ডে মার্গারাইন শিল্পের দুর্বৎসর বলা যেতে পারে। কাঁচামালের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছিল। ১৯০২ সালে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে ভারতে বাদাম তেলের রেকর্ড দরের মত। ফলে রটারডামের চেম্বার্স অব কমার্সের বাৎসরিক বিবরণীতে নতুন ধরণের সস্তা কাঁচা-মাল সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়।

এখন থেকেই সস্তায় নতুন কাঁচামাল সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। গোড়া থেকেই মার্গারাইনে দু'ধরণের কাঁচামাল ব্যবহৃত হ'য়ে আসছিল। বেশীর ভাগই জান্তব চর্বি, স্বল্প পরিমাণ ভেষজ তৈল। এখন গবেষণা চলতে লাগল, ভেষজ তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কিনা।

গোড়ার দিকে মার্গারাইনে ভেষজ তৈল হিসাবে একমাত্র অলিভ অয়েলই ব্যবহৃত হ'ত। এই তেলও মহার্ঘ হ'য়ে পড়ল। হেনরী

জার্জেনস্ ক্রাসিং সেন্টারে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন স্বল্প মূল্যের কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

মার্সিলিসের এক তেলের ব্রোকার প্রতিষ্ঠানের নাম বার্থিলেমি এণ্ড ক্যাসিলি। এঁরা তিলতেল এবং বাদাম তেলের গুণের প্রতি হেনরীর মনোযোগ অকর্ষণ করলেন।

মার্গারাইনে এই তেলগুলির স্বচ্ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেন হেনরী জার্জেনস্। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাজার থেকে বোম্বাই এবং কলকাতা বন্দর দিয়ে বাদাম এবং তিল তেল যেতে সুরু করল। আর চীন দিতে থাকল বাদাম তেল। অলিভ অয়েলের বিকল্প হিসেবে তিল তেলের চেয়ে বাদাম তেলের সমাদর হ'ল বেশী। কারণ তিল তেলে রং এবং গন্ধ দুটোই বেশী। এইভাবে পর পর তেলের বীজের তেল, নারকেল তেল, সয়াবিন তেল বনস্পতিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

জান্তব চর্বির সরবরাহে ঘাটতি এবং দরবৃদ্ধির ফলে ভেষজ তৈলের ব্যবহার শুরু হ'ল। প্রতিকার হ'ল কাঁচামালের অভাবে মার্গারাইনের শিল্পের অচলাবস্থার।

জন জার্জেনস তাঁদের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান সাইমন ভ্যানডেন বার্গদের কারখানায় এই শিল্প মাখনের নমুনা নিয়ে নিজে গিয়েছিলেন কেন, এ রহস্য অন্ধকারেই থেকে যাবে। কিন্তু এর ফলেই ভ্যানডেন বার্গরাও উৎসাহিত হয়ে এই আবিষ্কারকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগালেন।

ডাচ্‌দেশের মার্গারাইন শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল তাদের মাখন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে ইংলেণ্ডের মত ঢালাও বাজার। ইংলণ্ড এবং জার্মানীর লক্ষ লক্ষ শিল্প শ্রমিকদের সুলভে চর্বি জাতীয় খাদ্যের চাহিদার ফলেই এর উদ্ভব, উৎপাদন এবং প্রসার।

ভারতে মার্গারাইনের ফরমূলাতেই উদ্ভব হল বনস্পতির। মহার্ঘ ঘৃতের সুলভ বিকল্প। এদেশে কাঁচামাল হিসেবে ভেষজ তৈল প্রচুর।

বনস্পতি ভারতের বাজার দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেলল। গোড়ার দিকে হোসেন-কাসেম দাদা ছিলেন ভারতে বনস্পতির সোল এজেন্ট। সেদিন জনসাধারণকে বনস্পতি ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল। ভ্যানে ক'রে অফিস এলাকায় ভ্রাম্যমান প্রচারক ঘুরে বেড়াত। বনস্পতিতে ভাজা লুচি, খাবার দাবার বিতরণ করত। ক্ষুধিত মানুষ একপা এগিয়ে পিছিয়ে আসত দু'পা। কেউ জাত যাবার ভয়ে। কেউ বুকের দোষ বা কল্পিত অন্ধত্ব থেকে আত্মরক্ষা করতে। সে সব কথা এখন কিম্বদন্তী।

মিঃ দত্তর নোটবুকের উপসংহারে লেখা আছে: ভারতে বনস্পতি শিল্পের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির মূলে ছিলেন ডাঃ চৌধুরী। জার্মানীর মার্গারাইন কারখানায় তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মী। ভারতের অয়েল টেক্‌নোলজিষ্টদের ভেতর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। ভারতীয় বনস্পতি শিল্পের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া দরকার।

নোট বইখানা শেষ ক'রে আমার মাথার মধ্যে কেবলই একটা কথা ঘুরপাক খেতে লাগল। কে এই ডাঃ চৌধুরী? তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় কি? কার কাছে তাঁর সম্বন্ধে জানা যাবে?

শুনতে পেলাম, মিঃ শীল, তাঁর হাতে গড়া একজন এক্সপার্টই শুধু নন, তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। সাহস ক'রে তাঁর কাছে একদিন কথাটা পেড়েছিলাম। ডাঃ চৌধুরী সম্পর্কে কোন কথাই তিনি আমাকে বলতে চান নি।

তাঁকে দোষ দিই না। মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিলাম, মিঃ শীল তাঁকে ভক্তি করেন দেবতার মত। দেবতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোন্ ভক্ত পছন্দ করে? তাঁর কাছে ডাঃ চৌধুরী সম্পর্কে কিছু জেনে নিয়ে আমি যদি শিব গড়তে বাঁদর গড়ে ফেলি?

আমার শিব গড়ার মত ধৃষ্টতা নেই; মানুষকে বাঁদর করে গড়ার মত নীচ মনোভাবও আমি পোষণ করি না। মানুষকে তার প্রাপ্য

সম্মান আমি সব সময়ে দিয়ে থাকি। মানুষের মধ্যে ভাল দেখলে ভালও যেমন বলি, মন্দ দেখলে 'মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্' এই আপ্ত বাক্য জানা সত্ত্বেও মন্দই বলি। আমার বিশ্বাস তাতেই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হয়। কেবল প্রশস্তি করাকে চাটুকারিতা বলে ; কেবল নিন্দা করাকে বলে শত্রুতা। দুটোই আমার কাছে সমান ঘৃণ্য। ভালোয়-মন্দয় মেশানো মানুষ তাই আমার চোখে তখনই মহৎ যখন নিন্দা এবং প্রশংসায় সে সমান নির্বিকার।

মিঃ শীলের কাছে ডাঃ অনঙ্গমোহন চৌধুরী সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ে নিরাশ হয়েছি। এবং তারপর এই কথাগুলো ভেবেছি। কষ্ট পেয়েছি মনে মনে। সুজিত-সুভাষের কাছে কথা প্রসঙ্গে বলেছি সেকথা। তারা সান্ত্বনা দিয়েছে। তারা সামান্য হলেও ডাঃ চৌধুরীর কিছুটা পরিচয় দিয়েছে আমাকে। দেখলাম, দোষে গুণে মিশিয়ে ডাঃ চৌধুরী মিঃ শীলের যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন, এদের কাছে তার চেয়ে বেশী বই কম শ্রদ্ধার পাত্র নন।

মাসখানেক পরে। মিঃ দত্তকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললাম—শেষ পর্যন্ত কাকে বহাল করলেন ?

মিঃ দত্ত একটু সলজ্জ হাসেন—যিনি অবিবাহিতা যুবতী এবং গ্র্যাজুয়েট, তাকে।

—একদিন চাক্ষুস করাবেন তাঁকে ?

—কেন, প্রেম-ট্রেম করবার কোন কু-মতলব আছে নাকি ?

—ধরুন, সেই রকমই কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আপত্তি আছে আপনার ?

—না, আমার কেন আপত্তি হবে ? তবে সে রকম চান্স আপনি পাবেন না।

—কারণ কি বলুন তো মিঃ দত্ত ?

—কারণ, প্রথমতঃ আপনি একটা আস্ত বোকারাম। গোমরামুখো ভালোমানুষদের দ্বারা প্রেম হয় না। আমি হলফ্ করে বলতে পারি, মেয়েদের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস কখনও হয় নি আপনার। তাদের সঙ্গে প্রেম করা তো দূরের কথা—

—বিয়ের লাইসেন্সটুকু ছাড়া এ ব্যাপারে আপনার প্রেমের নথিপত্র কিছু আছে?

মিঃ দত্ত উত্তেজনার মুখে ব'লে বসলেন, কথাটা সত্যি কি মিথ্যে ভগবান জানেন,—আছে বই কি মশাই, আছে; একটা আধটা কি? আর সেই জন্যেই তো বউটা পাগল হ'য়ে গেল—দিনরাত সন্দেহ ক'রেই তো নিজের মাথাটা বিগড়ে ফেললে—

তাঁর মনের অবস্থা বুঝবার জন্যে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর গম্ভীর হ'য়ে বললাম—মনের দিক থেকে আপনাকে ভয়ানক নিঃসঙ্গ মনে হয় মিঃ দত্ত। আপনার কোথায় যেন একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে, কেউ তার খোঁজ রাখে না—

মিঃ দত্তর কণ্ঠস্বর বেদনায় ভারী হয়ে এল—জানেন সত্যবাবু, আমার স্ত্রীর সন্দেহ যে কত অমূলক, তা তাকে যত বুঝিয়েছি, তার সন্দেহ তত বেড়ে গেছে। আমাদের দাম্পত্য জীবনে যতখানি সততা, নিষ্ঠা পালন করা উচিত, আমি তার একরত্তি নড়চড় করি নি। তবু সন্দেহ-বাতিক তার বুকে তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে। সেইটাই ক্রমশঃ বিকারগ্রস্ত ক'রে তুললো তাকে।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—ছেলেমেয়েগুলোর কষ্ট হচ্ছিল দেখে এই বুদ্ধি করলাম। একজন হোল-টাইমার গভর্নেস রাখলাম ওদের জন্যে। অস্বীকার করব না, ভেবেছিলাম—একটি পরিমার্জিত মন আছে, একটি স্নেহভরা হৃদয় আছে—এমনি একজন দুঃস্থা মহিলাকে বহাল করব। তাঁকে কোনও দিন অপমান করব না, এতটুকু অসম্মান করব না তাঁর। তাঁকে যে দক্ষিণা দেব, তার বিনিময়ে অতিরিক্ত যেটুকু চাইব, তা হোল তাঁর আন্তরিকতা, সুস্থ কোন বিষয়

নিয়ে আমাদের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা যাতে তাঁর সান্নিধ্যে কিছুটা নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি। এর বেশী দাবী আমার ছিল না। কিন্তু এই এক মাসের অভিজ্ঞতায় দেখছি, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটবার নয়।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করি—কেন, কি হল ?

মিঃ দত্ত বললেন—এই জন্যেই তো একটু আগে আপনাকে বললাম, কোন চান্স নেই তার কাছ থেকে কিছু পাবার।

—কেন ?

—কারণ তার প্রণয়ী আছে। আর সে ধাওয়া করে আমার বাড়ীতে। মজা কি জানেন, আমার অনুপস্থিতিতে মহিলা তাঁর প্রণয়ীকে আপ্যায়ন করেন আমারই পয়সায়। এক মাসের ব্যয় তিনি যা দেখিয়েছেন, আমার তা দু'মাসের রোজকারও নয়।

—বলেন কি মিঃ দত্ত ?

—এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না—সত্যবাবু!

—কেমন বলি নি আপনাকে ? তখন যে বড্ড গোঁসা হল, এখন ঠেলা সামলান। অথচ আমি যাকে নিতে বলেছিলাম—

—আপনি হয়ত ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু কি জানেন, যাঁর স্বামী বিকৃত মস্তিষ্ক, তিনি আমার বাড়ীতে মুখ কালো করে থাকবেন আর যখন তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন আমার মতো, এতে আমার মন সায় দেয় নি।

—এখন কি করবেন ?

—ভাবছি, আর কয়েকটা দিন যাক। তারপর ও পাট চুকিয়ে দেব। ছেলেমেয়েদের আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো।

—সে ব্যবস্থা মন্দ নয়।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে মুখ হাত ধুচ্ছি, এমন সময় চা নিয়ে বিন্দু এসে হাজির।

তাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—এ কি বিন্দু, তুমি বিয়ে বাড়ীর নেমন্তন্নে যাওনি ?

গতকাল শুনেছি, মাসীমাদের বাড়ীর সবাই বিবাহ উপলক্ষ্যে এক আত্মীয়ের বাড়ী যাবেন। বাড়ী থাকবে শুধু তাঁদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া। বাড়ীর রান্নাবান্নার কাজ তাঁরই ওপরে। বিন্দুরও যাবার কথা। তাকে চা নিয়ে আসতে দেখে তাই অবাক না হয়ে পারলাম না।

বিন্দু আমার কথার জবাবে বলল—না, শরীর খারাপ ব'লে আমি গেলাম না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম—কিন্তু অসুস্থ শরীরে তুমি আমার জন্যে চা নিয়ে এলে কেমন ক'রে ?

বিন্দু বলল—এই কষ্ট আর বিয়ে বাড়ী যাওয়ার কষ্ট সমান হ'ল ?

আমার মুখ হাত ধোয়া শেষ হতেই বিন্দু গামছাটা এগিয়ে দিল আমার হাতে। ইতিমধ্যে সে চায়ের কাপ রেখেছিল টেবিলে। তার হাত থেকে গামছাটা নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললাম—নেমন্তন্ন পেয়ে কেউ ছাড়ে, এ আমার ধারণার বাইরে।

বিন্দু হেসে উঠল—পেটুক লোকেরা এমনি কথাই বলে থাকে। আমার তো নেমন্তন্ন বাড়ীর নাম শুনলে গা গুলোয়। সে যাক, আপনাকে আজ পড়াতে যেতে দেব না। এতবড় বাড়ীতে আমরা দুজন মাত্র মেয়েছেলে রয়েছি, পাশে একজন বেটাছেলে রয়েছে জানলে তবু অনেকখানি সাহস হয়।

—পড়াতে না হয় না গেলাম, কিন্তু মেসে খেতে তো যেতে হবে ?

—সে ব্যবস্থা আমাদের বাড়ীতে হলে আপত্তি আছে ?

—কিন্তু মেসের মিলটা যে নষ্ট হবে ?

—হবে না, সে যে কেউ খেয়ে নেবে। নিন, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

—তুমি আচ্ছা মেয়ে যা হ'ক।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। বিন্দু সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার পানে

চেয়ে মুচকি হেসে বলল—বোনের কিছু কিছু আবদার ভাইকে রাখতে হয়।

আমি হঠাৎ ব'লে ফেললাম—কিন্তু ছবি কি ভাববে বল তো?

বিন্দু ঘরে টুকিটাকি জিনিষ গোছাচ্ছিল। এলো চুল ঘাড় বেয়ে সামনের দিকে ঝুলছিল। চুলগুলো পিঠে ফেলে সোজা দাঁড়িয়ে বিন্দু জিজ্ঞাসা করল—কত মাইনে দেয় যে একদিন কামাই করলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে?

আমি হেসে ফেলি—বিনি মাইনের কাজেই আন্তরিকতা থাকা দরকার। এই ধর, তুমি আমাকে ঘর-গোছানো, বিছানা পাতা, তোলা ইত্যাদি ব্যাপারে রোজ সাহায্য ক'রে থাক। এর মধ্যে কোন আর্থিক লেনদেন নেই বলেই তোমার তরফ থেকে আন্তরিকতার অভাব নেই। একদিন যদি তুমি না ক'রে দাও, আমার কি মনে হবে? মনে হবে, কেন বিন্দু এল না? আমি কি কোন অন্যায় করেছি? কিংবা বিন্দুর কি কিছু হয়েছে? শরীর খারাপ টারাপ কিছু? এমনি কত চিন্তা মনে এসে ভীড় করবে। কেমন ঠিক কিনা?

বিন্দু বলল—অত কথায় কাজ কি বাপু, আপনি যাবেন পড়াতে; হ'ল তো?

আমি চা শেষ ক'রে বললাম—পড়াতে গেলে তো মেসে খেতেও যেতে হয়।

মুখখানা গম্ভীর ক'রে বিন্দু বলল—ওটাই বা কেন বাদ থাকে, সেরে আসবেন।

বিন্দু চায়ের কাপটা নিয়ে চলে গেল। ইচ্ছে হল তাকে বাধা দিই। হাত ধ'রে কাছে টেনে তার রাগ ভাঙ্গাই। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না।

মুহূর্তে মনটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। বিন্দু বাড়ীতে একা আছে; তাকে পাহারা দেবার দায়িত্ব কি আমার? মাসীমা তাহ'লে কিছু বলে যান নি কেন? বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি খেলেই হল? মেসের মিলটা

কেন নষ্ট করতে যাব ? তাছাড়া বিন্দুর অমন ক'রে কথা বলার কি অধিকার আছে ? ছবিকে পড়াতে যাই ব'লে ওর এত রাগ কিসের ? পোষাক বদলে বেরিয়ে পড়লাম। আমার নির্ধারিত কর্মসূচীর এতটুকু অদল বদল করতে রাজী নই। কারো কথাতেই নয়।

ছবিকে পড়িয়ে, মেসে খেয়ে-দেয়ে সাড়ে নটা নাগাদ বাসায় ফিরলাম। হাত-মুখ ধুয়ে বসলাম টেবিলের ওপর পা তুলে। একখানা বই নিয়ে পড়তে লাগলাম। কিছুতেই মন বসছিল না। রুটিন মাফিক সব সেরে বাসায় ফিরতেই মনে পড়ল বিন্দুকে।

ওপরে বারান্দায় আলো জ্বলছে। ঘরেও আলো। কিন্তু সাড়া শব্দ নেই কোথাও। মাসীমারা কত রাত্রে ফিরবেন কে জানে। ডেকে বিন্দুরখোঁজ নেব কিনা ভাবলাম। সঙ্কোচ হ'ল। এত রাত্রে ডাকাডাকি করলে পাড়ার লোকে কি ভাববে ? আমি ত একজন ভাড়াটে মাত্র। বিন্দুদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই।

বিন্দুর কথা বার বার মনে পড়ল।—বোনের কিছু কিছু আবদার ভাইকে রাখতে হয়।

একগুঁয়েমির ফলে আমি তার কথা রাখি নি। বিন্দু নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছে মনে। আর হয়তো সে আসবে না, কথাও বলবে না আমার সঙ্গে।

কতক্ষণ চিন্তায় ডুবেছিলাম জানি না, হঠাৎ চমকে দেখি—বিন্দু ঘরে ঢুকল। একটিও কথা বলল না সে। এলোমেলো ক'রে এই মাত্র রাখা গেঞ্জি আর জামাটা ঠিক ক'রে রাখল আলনায়। তারপর কিছু বলবে বলে মনে হ'ল। কিন্তু বলি বলি করেও বিন্দু কিছুই বলতে পারল না। আমি ভাবলাম, বিন্দু বুঝি খাবার জন্যে বলতে এসেছে। বিন্দুর বোঝা উচিত ছিল, আমি মেস থেকে খেয়ে এসেছি পেট ভরে। পেটে আর জায়গা নেই।

বিন্দু কিছুই বলল না। চুপ চাপ আমার মশারী খাটাতে লাগল। তারপর ভেতরে ঢুকে চারদিক গুঁজল। আমি আড়চোখে সব লক্ষ্য

করলাম। গোঁজা শেষ হ'লে বিন্দু নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে মশারীর ভেতর থেকে। তার আর কিছুই করবার নেই সেখানে।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুক্ষণ কেটে গেল, মশারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল না বিন্দু। আমার বুকের তাল ক্রমশঃ দ্রুততর হচ্ছিল ভয়ে আর উত্তেজনায়। মশারীর ভেতরে বিন্দুর অস্তিত্বটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সে কি জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে? সম্পূর্ণ নির্জনতার সুযোগে রাত দশটায় আমার ঘরে মশারীর ভেতরে তার প্রবেশের অর্থ কিছু ছিল নিশ্চয়ই। আমার কাজটুকু ক'রে দেওয়া। বোনের কল্যাণ হস্তের সেবা! কিন্তু মশারী ফেলা এবং গোঁজা শেষ ক'রে ভেতরে চুপচাপ বসে নিজেকে অমন রহস্যময়ী করে তুলছে কেন সে?

একটা ফোঁপানির শব্দ ভেসে এল মশারীর ভেতর থেকে। অর্থাৎ বিন্দু কাঁদছে। আমি শুক্‌নো গলায় ঢোঁক গিলে বলি—কি হল বিন্দু, কাঁদছ কেন?

অতিকষ্টে বিন্দু বলল—আপনাকে তখন অত ক'রে থাকতে বললাম, আপনি বোধ হয় কিছু মনে করেছেন। হয়ত ভেবেছেন, মেয়েটার মতলব খারাপ; বাড়ীতে কেউ নেই, এই ফাঁকে যা-তা একটা ক'রে বসবে।

আমি কাঠ হ'য়ে বসে রইলাম। বিন্দু কি মনের কথা টের পায় নাকি? বললাম—না, না, তুমি ব্যাপারটাকে বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছ, ও কিছু নয়।

বিন্দু মশারী থেকে বেরিয়ে এসে খপ ক'রে আমার পায়ে হাত দিয়ে হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে বলল—দয়া ক'রে আমাকে ভুল বুঝবেন না সত্যদা, ভাই-বোনের সম্পর্কে জোর খাটান যায় বলেই কথাটা বলতে সাহস হয়েছিল। মস্ত ভুল করেছি। এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে কথাটা বিশ্বাস করানো শক্ত। সে চেষ্টা আর করব না।

আমাকে একটিও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বিন্দু ধীরে ধীরে চলে গেল।

পরের দিন কারখানায় ভয়ানক হৈ চৈ পড়ে গেল। সুনীল বোস একটা কেলেঙ্কারী করে বসলেন।

একজন সুইপারকে দিয়ে তিনি একটি কাগজের ছোট্ট ঠোঙা পাঠালেন সার্জারীতে। কম্পাউণ্ডার জিজ্ঞাসা করলেন—কেয়া চিজ হ্যায়?

সুইপারের নাম বিদেশী। সে বলল—ক্যা মালুম, টাইপ বাবু দিয়া।

কম্পাউণ্ডার মিঃ দাস নাক সিঁটকিয়ে বলে উঠলেন—আরে রাম রাম। ডাক্‌দার সাব উন্‌কো টাট্টি লে আনেকো বোলা থা—তোমরা হাতমে বোসবাবু টাট্টি ভেজা—

—সাচ বাৎ!

—বিশোয়াস নেহি হোতা তো খুল কর্ দেখো!

সুনীল বোসের সারা গায়ে ফোঁড়া হয়েছিল। ডাঃ 'স্টুল' পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আজ সেটা এনে তিনি বিদেশীর হাত দিয়ে সার্জারীতে পাঠালেন।

জানতে পেরে বিদেশী ছুটল সুজিতের কাছে। মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল কারখানায়। সব ঝাড়ুদাররা দাবী করে বসল, এর সুবিচার চাই। টাইপ বাবু হাজার বার পায়খানায় মল-মূত্র ত্যাগ করুক, তারা সাফ করবে। কিন্তু তাদের দিয়ে মল বওয়াবার তাঁর ক্ষমতা নেই। পার্সোনাল অফিসারের কাছে কেস গেল। সুইপারদের একজন মুখপাত্র গেল ইউনিয়নের দুজন কমিটি মেম্বারের সঙ্গে।

অনেক চীৎকার এবং টেবিল চাপড়ানোর পর ব্যাপারটা মিটে গেল শেষ পর্যন্ত। সুনীল বোস একশো টাকা দিয়েই শুধু রেহাই পেলেন না, ক্ষমা চাইতে হল বিদেশীর কাছে।

ঘটনাটি রেখাপাত করল আমার মনে। প্রত্যেকটি মানুষ আজ কতখানি সচেতন হয়েছে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে। একেই বলে মানুষের জাগরণ। সকল শ্রেণীর মানুষ আজ সচেতন হলে তবেই তো দেশ উন্নত হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে মাথা উঁচু করে।

সেই দিন থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলাম বিদেশীকে।

১০

ডাঃ অনঙ্গ মোহন চৌধুরীকে চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আমি দেখেছি মিসেস চৌধুরী আর তাঁদের মেয়ে অনিতাকে। গায়ের রং এদেশীয় মেয়েদের মত নয় কিন্তু মুখশ্রী এবং একমাথা পাছা অবধি ঝাঁপিয়ে পড়া কাল কেশে অনিতা ভারতীয় মেয়েদের মত। তার ঘন নীল চোখের তারায় ছিল সীমাহীন দুর্বোধ্যতা ; বাঁশীর সঙ্গে তুলনীয় নাসিকায় ছিল সংহত সৌন্দর্য, বিম্বফলের মত রক্তিম ওষ্ঠাধরে ছিল দৃঢ়তা এবং নমনীয়তার সংমিশ্রণ।

এই কারখানার ভেতরে গঙ্গাতীরের কাছেই আকাশ-ছোঁয়া ম্যানেজ্‌মেণ্ট বাংলোয় কেটেছে অনিতার যৌবনের রঙীন দিনগুলি। সকাল-সন্ধ্যা কাটত, গঙ্গাতীরের মনোরম পরিবেশে বেড়িয়ে। ফুলে ভরা বাগানের সৌন্দর্য দেখে মালঞ্চের মধ্যে ইট সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী হেলান দেওয়া আসনে বসে স্নিগ্ধবাতাসে দেহমন জুড়িয়ে নিয়ে, কখনো আপন মনে দোলনায় দুলে।

সুজিত-সুভাষের মুখে শুনতে শুনতে মন সে সব দিনে পৌঁছে যেত কল্পনার পাখা ভর ক'রে। ওরা যা বলত, মানশ্চক্ষে আমি তার চেয়ে বেশী দেখতে পেতাম। আভাষে যেটা শুনতাম, মনে মনে সেটা নিয়েই অবসর সময়ে নাড়াচাড়া করেছি। তাতে অনেক ফাঁক পূর্ণ হয়েছে।

সুজিত-সুভাষের কাছ থেকে ডাঃ চৌধুরীর সামান্য পরিচয়ই পেয়েছিলাম। কর্মসূত্রে তাঁদের সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ ঘটেছে, শুধু সেইটুকু মাত্র। কর্মবীর ডাঃ চৌধুরীকে তাঁরা দেখেছেন, মানুষ হিসেবে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন, সে সবই এই কারখানার কার্যকালের মধ্যেই। তার আগের পরিচয় জানবার আগ্রহ আমার মেটার প্রয়োজন ছিল। কেবলই মনে হ'ত, ডাঃ চৌধুরীর জার্মান প্রবাসের কথা কিছু

কিছু জানতে পারলে ভালো হত। পরলোকগত ডাঃ চৌধুরীর স্ত্রী এখনো কলকাতাতেই রয়েছেন। শুনলাম, তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জার্মান ভাষা শিক্ষা দেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললাম, বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর সঙ্গে গিয়ে একদিন দেখা করব। মিঃ শীলের মত তিনি নিশ্চয়ই আমাকে হেয়জ্ঞান করবেন না।

আমার এ অনুমান মিথ্যে হয় নি।

মাসখানেক ধ'রে ভেবেছি যাব কি যাব না। শেষে একদিন মনস্থির ক'রে বেরিয়ে পড়লাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

দেখা হ'লে কি ক'রে মনের অভিপ্রায় জানাব, সেটা দিন কতক রিহার্স্যাল দিয়ে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও তাঁকে দেখেই সব গুলিয়ে গেল। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের দোতলায় একটা হলঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন মিসেস চৌধুরী। সারি সারি চেয়ার পাতা। দেওয়ালে বড় বড় মনীষীদের অয়েল পেন্টিং। উত্তরদিকের দেওয়ালে একটা বড় ওয়াল-ক্লকে তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

চেয়ারে বসে মিসেস চৌধুরী তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। কাথাবার্তা ইংরেজিতেই চলছিল।

মিসেস চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়ংম্যান, বল কি করতে পারি তোমার জন্যে ?

আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—মাফ করো তোমাকে তো ঠিক—

—আমি, মানে—আমি বনস্পতি কারখানায় চাকরী করি। মিঃ শীল আমার পরিচিত।

উৎফুল্ল স্বরে মিসেস চৌধুরী বললেন—তাই নাকি, বেশ, বেশ! হ্যাঁ শীল আমার সান-ইন-ল। খুব বুদ্ধিমান ছেলে। বলতে গেলে আমার স্বামীর হাতেই মানুষ। অনেক মমতা দিয়ে তিনি বনস্পতি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু কি একটা? আরও কত? কিন্তু সব কি

যে হ'য়ে গেল! যাক, ভাল কথা,—শীল, অনিতা, ছেলেমেয়ে সব ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ, সবাই ভালো আছেন।

—তোমাকে দেখে খুবই খুশী হলাম। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, হঠাৎ কি কারণে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? তোমার কি জার্মান ভাষা শেখবার ইচ্ছে আছে?

—না ম্যাডাম, আমি এসেছিলাম অন্য কারণে।

—কি কারণ, বলতে আপত্তি আছে? তাহ'লে শোনাতে হবে না। তুমি কি আমার বাসায় যাবে?

—না ম্যাডাম, আমি আপনার বাসায় আজ যাব না, পরে যাব। আমি এসেছি ডাঃ চৌধুরী সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে।

—হাউ ফানি! সে শুনে তোমার কি লাভ?

—এদেশে বনস্পতি শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে হয়।

—সে তো শীলের কাছ থেকেই জানতে পারতে, কষ্ট করে আমার কাছে আসার কি দরকার ছিল?

—আমি তাঁর জার্মান প্রবাস থেকেই সব কথা জানতে চাই।

শুনে মিসেস চৌধুরী বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভাল করে দেখলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু কেন এসব কথা জানতে চাইছ? তুমি কি তাঁর জীবনী লিখবে?

—তেমন কোন উদ্দেশ্য নেই ম্যাডাম।

—তাহ'লে?

—কিছু কিছু জিনিস জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হয়। সেটা না মেটা পর্যন্ত ভয়ানক অশান্তি বোধ করি মনে মনে। না জানা পর্যন্ত অস্বস্তি দূর হয় না। আশা করি, আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।

—তাহ'লে তোমাকে আমার বাসায় যেতে হবে। রবিবার বিকেলের দিকে আমি ফ্রি থাকি। এই নাও বাসার ঠিকানা।

—আপনাকে বিরক্ত করলাম ত?

—না, না ধন্যবাদ।

সেদিন খুশীমনে ফিরে এসেছি ইউনিভারসিটি থেকে। কলেজের ছুটির সময় তখন। সিঁড়ি দিয়ে নামছে ছাত্র-ছাত্রীর দল। কথাবার্তায় তাদের প্রাণ প্রাচুর্য যেন উপচে পড়তে চাইছে। জড়োসড়ো হ'য়ে একপাশ দিয়ে নামতে নামতে মনে হ'ল এরা কত ভাগ্যবান। পিতামাতার সঙ্গতি আছে। পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাথায় চিন্তার বোঝা নেই। অস্তিত্বের জন্যে এদের সংগ্রাম শুরু করতে হয় নি পাঠ্যাবস্থা থেকেই। এদের ভাগ্যে আমার ঈর্ষা হচ্ছিল।

একটা করে সিঁড়ি নামছি আর মনে হচ্ছে, আমার মনটা যেন ওপরে উঠছে। যেমন ক'রে লিফ্‌ট ওঠে আর ঝোলানো তারটা নামে নীচের দিকে।

আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যে স্নাতক উপাধিধারী। আমি কি স্নাতকোত্তর কোনও বিভাগেও উত্তীর্ণ হ'তে পারি না? বিদ্যার এই পীঠস্থানটিতে এই ধরণের চিন্তা হঠাৎই উদয় হ'ল মনের মধ্যে। আমি এম. এ. পরীক্ষা দেব।

কোন্‌ বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়? জীবিকার তাগিদে 'বাণিজ্য' নিয়ে পড়েছি; কিন্তু আমার আকর্ষণ সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে প্রাইভেটে এম. এ. দেবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?

ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটে পড়তেই মনের ভারসাম্য ফিরে পেলাম। সামনের রবিবার যেতে হবে মিসেস চৌধুরীর বাসায়।

আকুল প্রতীক্ষার পর সেই দিনটি এলো। সকাল সকাল মেস থেকে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস চৌধুরীর বাসায় এসে যখন পৌঁছলাম, তখন চারটে বেজে গেছে।

আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। তাঁর সুন্দর আসবাবপত্রে সজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—চা না কফি দেব?

আমি বললাম—কোনোটাই দরকার নেই, ধন্যবাদ।

তিনি বললেন—তাকি হয়? এক কাপ কফি খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে।

নিজে হাতে কফি ক'রে নিয়ে এলেন তিনি। সেই প্রথম কফি খেলাম। একটু কেমন যেন পোড়া পোড়া স্বাদ পেলাম সেদিন। কফিসেবীদের মুখে শুনেছি, এই স্বাদটার জন্যেই কফি তাঁদের কাছে এত প্রিয় পানীয়।

মিসেস চৌধুরী সেদিন ডুব দিলেন তাঁর অতীত স্মৃতির মধ্যে। ঘড়ির কাঁটা আপন নিয়মে ঘুরেই চলল। কিন্তু সে বিষয়ে কোন খেয়ালই ছিল না আমাদের। একজন তাঁর স্মৃতির সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছেন, আর আমি তা কৃপণের মতো সংগ্রহ ক'রে চলেছি মনের ঝুলিতে।

ডাঃ চৌধুরীর জার্মান প্রবাসের যে কাহিনী মিসেস চৌধুরী ব্যক্ত করলেন, তা তাঁর জবানীতে পুরোপুরি বলতে পারলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু তাতে অসুবিধে হ'ত এই, আমি ঠিক যেমনটি ক'রে পাঠকদের বলতে চাই, তেমন ক'রে বলা হতো না। কথাগুলো তাঁরই। আমার ভূমিকা এখানে শুধু সূত্রধরের।

তাছাড়া মিসেস চৌধুরীর কথাগুলো শুনে নিজের মত ক'রে বলার সুবিধে অনেক। কাজটাও অপেক্ষাকৃত সহজ। কাজেই সেই পথটাই বেছে নিলাম।

যে ঘটনা দিয়ে স্মৃতিকথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন মিসেস চৌধুরী, তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ঘটনাটার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ তিনি করেন নি। আমিও জিজ্ঞাসা করি নি, আমার যেটুকু জানবার, সেটুকু জেনেই মোটামুটি তৃপ্ত হলাম।

জার্মানীর এক রেঁস্তোরায় তু'জন ভারতীয় গভীর আলোচনায় রত। একজনের বয়স ছত্রিশের কাছাকাছি, আর একজনের বয়স চব্বিশের বেশী হবে না। তাঁদের সামনে ধূমায়িত কফির পাত্র।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করছেন বাইরে। কথার ফাঁকে ফাঁকে মৃত্ব চুমুক দিচ্ছেন কফির পেয়ালায়। খুব নিম্নস্বরে কথাবার্তা চলছিল তাঁদের মধ্যে।

হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে দেখা গেল রেঁস্তোরার সামনে। তাঁদের দেখেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। মাথায় টুপিটা প'রে মুখের বেশ কিছুটা অংশ আড়াল ক'রে ফেললেন। ফিস ফিস ক'রে যুবককে বললেন—যে প্যাকেটটা বাথরুমে লুকিয়ে রেখেছি, সেটা নিয়ে তুমি সোজা হ্যালে চলে যাও। ষ্টেশনে একটি মেয়ে অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে। পরিচয় দিয়ে তার হাতে প্যাকেটটা দেবে। সে তোমাকে নিয়ে যাবে তার মা ফ্রাউ রোজানবেয়ার্গের কাছে। তিনিই তোমাকে হ্যালে বিশ্ববিত্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে স্থযোগ স্থবিধে ক'রে দেবেন। আমি চললাম।

আমি প্রশ্ন করলাম—এঁরা কারা?

উত্তর পেয়ে চমকে উঠেছি। মিসেস চৌধুরী বললেন—বয়স্ক ব্যক্তিটি হলেন এম. এন. রায়। যুবকটি আর কেউ নন, স্বয়ং অনঙ্গমোহন চৌধুরী। হ্যালে ষ্টেশনে আমিই তাঁকে রিসিভ করতে গিয়েছিলাম। আমি ফ্রাউ রোজানবেয়ার্গের বড় মেয়ে ক্লারা।

সেটা উনিশশো চৌদ্দ সালের মাঝামাঝি হবে। জার্মানীর রাজনৈতিক আকাশে তুর্যোগের ঘনঘটা। তাদের প্রিয় ফার্ডিনেণ্ড আর তাঁর রাণীকে সিরাজেভোতে হত্যা ক'রল তুর্দান্ত প্রিনসিপ। তদন্তে দেখা গেল, সেই হত্যাকাণ্ডের পেছনে সার্ভিয়ার বড় বড় রাজপুরুষরা যুক্ত রয়েছেন।

জানা গেছে, সরকারী অস্ত্রাগার থেকে বোমা পিস্তল দেওয়া হয়েছে হত্যাকারীকে। ফলে ক্রুদ্ধ অস্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে তুদিনের মেয়াদে কতক-

গুলি দাবী মেনে নেবার জন্যে পাঠিয়েছে চরমপত্র। অন্যথায় যুদ্ধ বাধবে। রুশ নেবে সার্ভিয়ার পক্ষ আর জার্মানরা নেবে অস্ট্রিয়ার। অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ।

এই রকম যখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, প্রায় সেই সময়েই উচ্চশিক্ষার জন্যে জার্মানীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন অনঙ্গমোহন। র‍্যাডিক্যাল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল সেখানে। এম. এন. রায় তখন ইংরেজ সরকারের অনভিপ্রেত ব্যক্তি। গা ঢাকা দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরছেন ভারতের মুক্তি কামনায়। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ঝাখার ছিলেন মানবেন্দ্র রায়ের গুণমুগ্ধ বন্ধু। 'আন্তর্জাতিক আইনে রাজনৈতিক অপরাধীদের আশ্রয়-দানের অধিকার' বিষয়ে গবেষণা পুস্তক লিখে 'ডাক্তার অফ্ জুরীসপ্রুডেন্স' উপাধি পেয়েছেন। ডারউইনের ক্রমবিকাশ মতবাদে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তাছাড়া আর্নষ্ট হ্যাকেল ও সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক ঔষ্টভাল্ড পরিচালিত 'মনিষ্ট সঙ্ঘ'-এর উৎসাহী সভ্য ছিলেন ডাঃ ঝাখার।

এই সঙ্ঘের সভ্যরা ছিলেন যুদ্ধ দ্বারা লোকক্ষয়ের বিরোধী। তাঁরা বিশ্বাস করেন, ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী মানুষ প্রগতিশীল হ'চ্ছে। আরও হ'বে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিশ্বের মানুষকে আবদ্ধ করেছে প্রীতিসূত্রে। এই প্রীতিবন্ধন ক্রমশঃই দৃঢ়তর হবে।

অনঙ্গমোহনের গৃহকর্ত্রী ফ্রাউ রোজানবেয়ার্গের গৃহে মাঝে মাঝে আসতেন ডাঃ ঝাখার। অনঙ্গমোহনের পড়াশুনার খবর নিতেন। আলোচনা করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সেদিন ফ্রাউ রোজানবেয়ার্গ তাঁকে সান্ধ্য ভোজন সেরে যেতে অনুরোধ করলেন। ডাঃ ঝাখার সানন্দে সম্মতি জানালেন প্রস্তাবে।

ভোজন টেবিলে বসে রাজনৈতিক আলোচনা চলছিল।

গৃহকর্ত্রীর কন্যা ক্লারা বললেন—আমার এক ইংরেজ বান্ধবী বলছিল, যুদ্ধ বাঁধলে ইংরেজ সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। পক্ষ নিলে সে নেবে

জার্মানীর, রুশকে ধ্বংস ক'রে প্যানস্লেভ ইউনিয়নের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেবে। আর ভারতবর্ষ মুক্ত হবে রুশের আতঙ্ক থেকে।

অনঙ্গমোহন ক্লারার কথা শুনে চিন্তিত মুখে বললেন—ইংরেজের রাজনীতি আর নৌবলের সঙ্গে জার্মানীর বিজ্ঞান আর সৈন্যবল মিলিত হলে তাদের প্রতাপে তুনিয়া থরহরি কাঁপবে।

গৃহকর্ত্রী ডাঃ ঝাখারকে জিজ্ঞাসা করলেন—এমন সম্ভাবনা আছে নাকি হের ডক্‌টর ?

ডাঃ ঝাখার সহাস্যে জবাব দিলেন—না, ফ্রাউ রোজানবেয়ার্গ, আমি তা মনে করি না। ইংরেজরা কূটনীতিতে খুবই ধুরন্ধর। তারা পৃথিবীতে একমাত্র শক্তিশালী ব'লে মনে করে জার্মানীকে। রুশ বা ফরাসীকে বিধ্বস্ত করে তারা আমাদের শক্তিশালী হ'তে দিলে সেটা তাদের বোকামি হবে। তাই নয় কি ?

গৃহকর্ত্রী সে কথায় সায় দেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের রণদামামার মধ্যে উদ্বিগ্নভাবে দিন কেটেছিল অনঙ্গ-মোহনের। দেখেছেন, যুদ্ধকালীন জার্মান দেশের প্রতিটি নাগরিকদের কি শৃঙ্খলাবোধ, কি স্বদেশ প্রেম। শিশু থেকে বৃদ্ধ নরনারী সকলের মুখে দেখেছেন উৎসাহ আর সংকল্পের দৃঢ়তা। জার্মানীর সোসালিষ্ট পত্র 'ফক্স ব্লাট' যুদ্ধকে আখ্যা দিল স্বাধীনতার সংগ্রাম ব'লে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র সেনাবাহিনী প্রহরারত। সেতু, জলের কল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বড় বড় কারখানা,টেলিগ্রাফ অফিস, রক্ষার ব্যবস্থা হ'ল সৈনিকদের দিয়ে।

সেদিন রাত্রি প্রভাত হবার আগেই ক্লারা গিয়ে করাঘাত করলেন অনঙ্গমোহনের দরজায়। কোনো রকমে স্লিপিং গাউনে শরীর ঢেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন অনঙ্গমোহন। দেখেন ক্লারা দাঁড়িয়ে। চোখে মুখে উত্তেজনা।

অনঙ্গমোহন সুপ্রভাত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার ক্লারা ?

ক্লারা বললেন—অধ্যাপক জোরে নিহত।

—কে ? অধ্যাপক জোরে নিহত ? কারা হত্যা করেছে ?

—কাল সন্ধ্যায় প্যারিস এক্সচেঞ্জের কাছে এক কাফেতে ব'সে তিনি সোসালিষ্ট ডাঃ ফ্রাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন যুদ্ধ বন্ধ করতে। সেই সময়ে মিলেইন রিভলভারের গুলিতে তাঁকে হত্যা করে। এই দেখুন সংবাদপত্রে এই দুঃসংবাদ বেরিয়েছে।

স্থানীয় একখানা সংবাদপত্র দিয়ে চলে গেলেন ক্লারা। অনঙ্গমোহন সংবাদপত্রখানা নিয়ে সোফায় বসলেন। বিশ্বপ্রেমিক জোরের মৃত্যুতে জার্মানীর প্রতিটি নরনারীর দুঃখের ছায়া যেন তিনি দেখতে পেলেন ক্লারার মুখে। তাঁর মুখে একটি তিক্ততা ফুটে উঠতে দেখেছেন অনঙ্গ-মোহন। সে যেন ভেঙ্গে পড়েছে। আর্ক ডিউককে সস্ত্রীক হত্যা ক'রে যে যুদ্ধের আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে, তাতেই আত্মাহুতি দিলেন অধ্যাপক জোরে। বিশ্বপ্রেমের কঠোর দণ্ডের কথা ভেবে শিউরে উঠলেন অনঙ্গমোহন।

বার বার পড়লেন সংবাদপত্রখানা। হত্যাকারী বলেছে—আমি ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা ভীষণ দেশদ্রোহীকে হত্যা ক'রে গৌরববোধ করছি। গত অর্ধ শতাব্দী ধ'রে অধ্যাপক জোরে ফ্রান্সের সৈন্যবৃদ্ধি, সমরোপকরণ তৈরী, দুর্গ সংস্কার ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের ব্যয় বরাদ্দে বাধা দিয়ে দিয়ে জাতিকে আত্মরক্ষায় অক্ষম করেছেন, এ হত্যা তারই শাস্তি। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্মদাতা ফ্রান্স বেঁচে থাক। আমি মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিচ্ছি।

পড়তে পড়তে আধ্যাপক জোরের প্রতি অনঙ্গমোহনের সহানুভূতির শিকড় আলগা হ'য়ে এল। তিনি ভাবলেন, মিলেইন যা বলেছে, তা ঠিক। পৃথিবীর সকল জাতির যুদ্ধ প্রচেষ্টা বন্ধ না হ'লে একটি দেশকে প্রতিরক্ষার ব্যয় সঙ্কোচে বাধ্য করা অযৌক্তিক।

ঘণ্টখানেক পরে অনঙ্গমোহনের এক জার্মানী বন্ধু ডাঃ স্থূরাস এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। করমর্দন ক'রে বললেন—নিজেকে উৎসর্গ করতে যাবার আগে দেখা করে যাচ্ছি।

—কি ব্যাপার ?

—ছাত্রাবস্থায় বাধ্যতামূলক যুদ্ধশিক্ষার সুযোগ লাভ করেছি। চুক্তি হয়েছিল, যুদ্ধসজ্জার আদেশ প্রচারিত হবার ছ'ঘণ্টার ভেতরে কাছাকাছি কোনও সেনাবাসে গিয়ে নাম লেখাতে হবে। আমি চললাম গোটিংটেনে, সেখানেই উৎসর্গ করব নিজেকে।

এই সময় ক্লারা ঘরে প্রবেশ করলেন প্রাতঃরাশ নিয়ে। ক্লারা উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন সেগুলি।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করলেন—হের স্কুরাস, কোন্ কোন্ শক্তি এই যুদ্ধে যোগ দেবে ব'লে মনে করেন আপনি ?

স্কুরাস জবাব দিলেন—সবাই। এ একটা বিশ্বযুদ্ধ হ'তে চলেছে।

—কে কোন্ পক্ষ নেবে ?

—সবাই আমাদের বিরুদ্ধে।

—কেন ?

—জার্মানী ইউরোপের হৃদয়। কাজেই তাকে ধ্বংস করাই সকলের লক্ষ্য। কিন্তু তা অসম্ভব হের চৌধুরী। আমাদের সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান আবহমান কাল পৃথিবীতে অমর হ'য়ে থাকবে।

অনঙ্গমোহন হ্যালে শহরের পথে পথে সেদিন দারুণ এক উত্তেজনা লক্ষ্য করেছেন সকলের চোখে মুখে। দেখে লজ্জায় নিজেকে ঘরের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চেয়েছেন। এদের মত নিজের দেশকে ভালবাসবার অধিকার নেই তাঁর। তাঁর মহান দেশ ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকের অধীন। এই যুদ্ধোন্মাদনার দৃশ্যে নিজেকে বড় ছোট, বড় অসহায় মনে হ'ত।

ক্লারা তাঁর মনের কথা বুঝতেন। সাধ্যমতো সান্ত্বনা দিতেন; নিজের মধুর সান্নিধ্যে উজ্জীবিত করতেন অনঙ্গমোহনকে।

বলতেন—এই বিশ্বযুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। তখন জার্মানীর লক্ষ্য হবে, ঔপনিবেশিকতার মূলোচ্ছেদ করা। তুমি ভেবো না হের চৌধুরী। তোমাদের দেশ স্বাধীন হবেই হবে। তোমাদের প্রাণে উত্তাপ আছে।

সেই উত্তাপে বিদেশীর শাসন শৃঙ্খল পুড়ে গলে যাবে একদিন না একদিন।

ক্লারার বাম হাতখানা নিজের মুঠোয় চেপে ধ'রে অনঙ্গমোহন বলেন —তোমার সান্ত্বনার জন্যে ধন্যবাদ ক্লারা।

হ্যালে শহরের পথে পথে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে পিতৃভূমির নামে জয়ধ্বনি তুলেছে অগণিত নরনারী। উৎসাহের তাড়নায় তরুণ জার্মানী ছুটেছে সেনাবাসের দিকে। কে আগে প্রাণ উৎসর্গ করবে, এই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

সেই দিনই সংবাদ ঘোষিত হ'ল, এত বেশী লোক স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্যে ভীড় করেছেন যে তাঁদের সামান্য অংশকেই গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছে।

বার্লিন থেকে প্রচারিত হ'ল, ফ্রান্সের স্বর্ণ বোঝাই বহু মোটর গাড়ী, জার্মানীর ওপর দিয়ে রাশিয়ায় যাচ্ছে। নাগরিকরা যেন মোটর গাড়ী গুলি পরীক্ষা ক'রে তবে যেতে দেন।

সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল ভয়ানক উত্তেজনা। পল্লীবাসী বৃদ্ধরা সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার অনুপযুক্ত। তাঁরা এই কাজ সানন্দে বেছে নিলেন। বন্দুক ঘাড়ে ক'রে রাজপথে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'শিশু জার্মানী'ও একাজের ভার নিয়ে দিনরাত পালাক্রমে পাহারা দিতে লাগল। পাস না দেখিয়ে যাওয়া বন্ধ।

একদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল। ফলাও ক'রে ঘটনাটা ছাপা হ'ল সব কাগজে।

জার্মান জাতির ভাগ্যবিধাতা জনপ্রিয় কাইজার উইলিয়ম এক গভীর রাত্রে পথে লাল আলো দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সম্রাটের গাড়ীর সংকেত জানান হ'ল বিগল্ বাজিয়ে। দেহরক্ষী চীৎকার ক'রে বলল— হিজ মেজেস্টি দি কাইজার।

শিশু বাহিনী তবু অনড়। পাস না দেখানো পর্যন্ত রাস্তা ছাড়বে না।

ক্রোধান্বিত কলেবরে কাইজার নেমে এলেন গাড়ী থেকে। শিশু বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন বজ্রকঠিনস্বরে—কেন তোমরা এমন করছো?

জবাব এল—সর্বশ্রেষ্ঠের আদেশ, আমাদের মহান সম্রাট কাইজারের আদেশ।

—স্বয়ং সম্রাট তোমাদের সামনে। আমার আদেশ, পথছাড়ো। বৃথা সময় নষ্ট ক'রো না।

ইওর মেজেষ্টিই সময় নষ্ট করছেন। পাস না দেখে গাড়ী ছাড়বো না। আমাদেরসবাইকে হত্যা না ক'রে স্বয়ং সম্রাটেরও যাবার অধিকার নেই।

বিস্ময়ে অভিভূত হলেন উইলিয়ম কাইজার। তাঁর পাস দিলেন এক বারো বছরের ছেলের হাতে। পরীক্ষা ক'রে বালকটি হাঁটু গেড়ে বসে সেটি ফিরিয়ে দিল সম্রাটকে। কর জোড়ে বলল—ইওর মেজেষ্টি, আমাদের স্পর্ধার জন্যে ক্ষমা চাইছি। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা আপনার আদেশ পালন করবো।

গভীর রাত্রে তারা ভরা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বালকদের কর্তব্য দৃঢ়তা এবং স্থির সঙ্কল্পের কথা শুনে কাইজারের ক্রোধ দূর হয়ে গেল। স্নেহে টল টল ক'রে উঠল তাঁর হৃদয়। চোখ থেকে ঝরে পড়ল আনন্দাশ্রু। শিশুদের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—দেশবাসী যেন তোমাদের মত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়।

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন অনঙ্গমোহন যুদ্ধের সময়ে জার্মানী থেকে। বড় বড় নামজাদা অধ্যাপকরা যোগদান করলেন যুদ্ধে। তাঁর সহপাঠিদের কেউ কেউ স্বেচ্ছাসেবক হ'তে না পেরে জীবন বিসর্জন দিতে লাগল। কেউ তাঁদের গভীর দুঃখের কথা এসে অনঙ্গমোহনকে জানান —আমাদের ভাগ্যে হ'লো না

দেখে অভিভূত হয়ে যান অনঙ্গমোহন। ক্লারাকে বলেন—কি আশ্চর্য বলত ক্লারা? যা দেখছি তা আমার ধারণার অতীত।

ক্লারা সহাস্যে জবাব দেন,—ওদের হতাশা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেশের জন্যে আত্মদান করতে পারল না, তবে বেঁচে থেকে কি লাভ?

এই অবস্থার প্রতিকার হ'ল কয়েকদিনের মধ্যেই। আদেশ এল, চাষীদের কাজে সাহায্য কর।

তাতেও অল্প সময়েই স্বেচ্ছাসেবক ভরে গেল। আর দরকার নেই। আবার যুবমহলে নৈরাশ্য দেখা দিল। আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আত্মরক্ষা সমিতির সনির্বন্ধ অনুরোধ এল, বিপরীতবুদ্ধি দেশ ভক্তরা যেন এভাবে মৃত্যু বরণ না করেন।

অনঙ্গমোহনের গৃহকর্ত্রী ফ্রাউ রোজেনবেয়ার্গ সেদিন কুশলপ্রশ্ন করতে এসে বললেন—হের চৌধুরী, আপনার কাছে কোন আপত্তিকর কাগজ নেই ত?

অনঙ্গমোহন হেসে জবাব দেন,—না ফ্রাউ রোজেনবেয়ার্গ, আমি অত বোকা নই যে আপত্তিকর কাগজপত্র রেখে নিজেকে বিপন্ন করব।

ফ্রাউ রোজেনবেয়ার্গ বললেন—আমি তা জানি। তবে কি জানেন, পাশের বাড়ীর মেয়েটা বড় খুঁতখুঁতে স্বভাবের। সে বলছিল, তোমাদের ভারতবাসী অতিথিকে সাবধান ক'রে দিও।

কয়েকদিন পরেই বিদেশীদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি ঘোষিত হল। ঘোষণায় বলা হ'ল, কাগজপত্র নিয়ে বিদেশীদের পুলিস অফিসে যেতে। সেখান থেকে পাস ইস্যু করা হবে। পাস সঙ্গে থাকলে কোন রকম লাঞ্ছনার ভয় থাকবে না।

ইউনিভারসিটির নিদর্শনপত্রগুলো নিয়ে অনঙ্গমোহন গেলেন পুলিস অফিসে। ক্লারা সঙ্গে গেলেন স্বেচ্ছায়। পুলিস অফিস লোকে লোকারণ্য। শিশুসন্তান কোলে নিয়ে দূর দুরান্ত থেকে এসেছে অসংখ্য নরনারী পাস সংগ্রহের জন্যে।

সেদিন একা গেলে অনঙ্গমোহনকে অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হ'ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত লাইন দিয়ে। ক্লারার সহায়তায় খুব অল্প সময়েই কাজ মিটেছিল তাঁর।

ফেরার পথে দুজনে গিয়ে পাশাপাশি বসেছিলেন একটা পার্কে।

অনঙ্গমোহন বললেন—ইচ্ছে ছিল, ডক্টরেট হ'য়ে এখানে হাতে কলমে কিছুদিন কাজ শিখে দেশে যাব। যুদ্ধ হঠাৎ সব তছনছ ক'রে দিলে।

ক্লারা সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন—মুষড়ে পড়বেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। সুসময়ের প্রতীক্ষা করুন।

অনঙ্গমোহন বললেন—জীবনের স্বপ্ন কয়েকটা বছর পিছিয়েযাবে ক্লারা?

ক্লারা চোখ রাখলেন অনঙ্গমোহনের চোখে—তার জন্যে আমাদের ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই হের চৌধুরী। যদি বেঁচে থাকি, আমাদের স্বপ্ন নিশ্চয়ই সার্থক ক'রে তুলবো।

ভবিষ্যতের সেই মধুর দিনগুলি যেন চোখের সামনে দেখছিলেন অনঙ্গ-মোহন। আশাভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি সম্মুখে মেলে ধ'রে বললেন—আমি এখান থেকে ডিগ্রী নেব। এক্সপার্ট অয়েল টেক্‌নোলজিষ্ট হয়ে ফিরে যাব ইণ্ডিয়ায়, আমার দীনা মাতৃভূমির স্নেহাঞ্চলে, সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলবো, শত শত নিরন্ন মানুষের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করব—আমার দরিদ্র দেশবাসী দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করবে আমাকে—ক্লারা, আমার এই স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে তুমি সেদিন আমার পাশে থাকবে তো?

ক্লারা আরক্ত মুখে জবাব দেন—ভবিষ্যতের সেই দিনগুলির অপেক্ষায় আমি বেঁচে থাকব শুধু আপনার জন্যে।

মিসেস চৌধুরী বললেন—ইতিহাসে পড়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের কথা। যুদ্ধ থামল। যুদ্ধোত্তর জার্মানী উঠে পড়ে লাগল ক্ষত থেকে আরোগ্য লাভ করতে। সব কিছুই আবার ঠিক ঠিক চলতে লাগল কয়েকদিন পরেই। পরিশ্রান্ত শ্রমিক একটু জিরিয়ে নিয়ে যেমন নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করে তেমনি।

তারপর একটা একটা ক'রে কয়েক বছর কেটে গেছে। অনঙ্গমোহন ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন। ডাঃ চৌধুরী জার্মানীর এক কারখানায় ঢুকলেন। সাবান এবং বনস্পতি শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতার জন্যে।

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার বনিয়াদ সুদৃঢ় ক'রে তৈরী করেছেন ডাঃ চৌধুরী। ক্লারাকে জীবনে বরণ করার কোন অন্তরায়ই হয় নি সেদিন। ফ্রাউ রোজেনবেয়ার্গ সানন্দে সম্মতি দিলেন তাঁদের মিলনে।

বাকী ছিল একটি সাধ। নিজের দেশে ফিরে আসা। মাতৃভূমির জন্যে প্রাণ কাঁদছিল ডাঃ চৌধুরীর। দেশে ফিরে যাবেন ক্লারাকে নিয়ে। শিল্পে অনগ্রসর ভারতে গড়ে তুলবেন নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান। উৎসাহী ক'রে তুলবেন পুঁজিপতিদের শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থ বিনিয়োগ করতে। শত শত নিরন্ন মানুষ সেই সব প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের উদরান্নের সংস্থান করবে। দেশের অনাদৃত সম্পদ কাজে লাগাবেন সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে। ভারতের শিল্পপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন ডাঃ চৌধুরী। শীঘ্রই ডাক এলো দেশ থেকে। ক্লারা সানন্দে পিতৃভূমি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে এলেন ভারতবর্ষে।

তারপর থেকেই ডাঃ চৌধুরী এক ধরেন, এক ছাড়েন। কিছুতেই যেন তৃপ্তি নেই তাঁর। এক হাতে গড়েন, ভাঙেন অন্য হাতে। ভাঙা-গড়া খেলার নেশায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে।

ইতিমধ্যে ক্লারার কোলে এসেছিল অনিতা। জার্মান আর ভারতীয় রক্তে গড়া অনিন্দ্যসুন্দরী অনিতা পিতামাতার চোখের মণি হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে।

অনিতার শৈশব কাটল বোম্বাইয়ে, কৈশোর কলকাতায়। তার যৌবনের উন্মেষকালে চৌধুরী-দম্পতি এলেন এই আধা-শহরে। ডাঃ চৌধুরী গঙ্গাতীরে এই পতিত জমিটুকুর ওপর গড়ে তুললেন বনস্পতি কারখানা। এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী টাকা ঢাললেন এর পেছনে।

এর পরের পরিচয় পেয়েছি সুজিত-সুভাষের মুখে। মিসেস চৌধুরীর কাছে সে পরিচয় শুনতেও চাই নি। উনি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে এসেই থেমে গেলেন। একটানা অনেকক্ষণ কথা ব'লে তিনি ক্লান্ত। একটা মধুর আবেশের মধ্যে যেন ডুবেছিলেন পুরাণো স্মৃতিকথা বলতে বলতে।

হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা বাজল। ক্লান্তস্বরে মিসেস চৌধুরী বললেন—শুনলেন ত? এই হ'ল তাঁর জার্মান প্রবাস আর ভারতে ফিরে আসার কাহিনী। এর পরের খবর তো কিছু কিছু শুনেছেন সহকর্মীদের কাছ থেকে, তাই বলছিলেন না?

আমি জবাব দিলাম—হ্যাঁ, শুনেছি। আর আপনাকে কষ্ট দেব না। অনেক রাত হ'ল। এবার উঠি। শুভ রাত্রি।

মিসেস চৌধুরী গেট অবধি এগিয়ে এসে আমাকে বিদায় জানালেন। ফেরার পথে ভাবছিলাম তাঁর উদারতার কথা। ডাঃ চৌধুরী সম্পর্কে আমার কৌতূহল মেটাতে তিনি কিছুমাত্র ইতঃস্তত করেন নি। যেটুকু জানিয়েছেন, সেইটুকুই আমার যথেষ্ট পাওনা। আমি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। তা সত্ত্বেও তিনি অনেক কথা আমাকে জানিয়েছেন। মিঃ শীল যে কেন জানালেন না, তিনিই জানেন।

১১

এর পরের কথা সুজিতবাবুর কাছে শোনা।

ডাঃ চৌধুরী মিলের ম্যানেজার। দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। ইউসুফ নামে এক শ্রমিক নেতাকে হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন তিনি। তাকে স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন তার কথা। ইউসুফ ছিল ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির চেয়ারম্যান। সুজিত সেক্রেটারী ছিল।

দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে জিনিষপত্রের অগ্নি-মূল্যের দরুণ সমাজে দেখা দিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। শিল্পসংস্থাগুলিতেও তেমনি লেগেছিল বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন। দেশে মহার্ঘ ভাতার চল হ'ল। মূল বেতন অনেক বেড়ে গেল আগের চেয়ে।

হিন্দুস্থান ভেজিটেবল মেকার্স শ্রমিক ইউনিয়নও বেতন বৃদ্ধির জন্যে আন্দোলন চালাচ্ছিল। ডাঃ চৌধুরী কথাবার্তা বলেন ইউসুফের সঙ্গে।

সুজিতকে ডাকেন না। তিনি বুঝেছেন, সুজিত ইস্পাতের চেয়েও কঠিন ধাতুতে তৈরী। তাকে কোনো রকমেই বাঁকানো যাবে না। তার সঙ্গে আলোচনায় সফল হ'তে হ'লে তার দাবী ষোল আনা মেনে নিতে হবে। এতটুকু নড়চড় নেই।

সেদিক থেকে ইউসুফ সমঝদার আদমি। তার কাছে একটা প্রস্তাব রাখলে সে বিবেচনা করে ঠাণ্ডা মাথায়। মিষ্টি কথায় বশ মানে ইউসুফ। তার ব্যক্তিগত সুযোগের দিকে সামান্য দৃষ্টি দিলেই সে মোটামুটি খুশী।

বেতনবৃদ্ধি নিয়ে দীর্ঘ দিন আলোচনা হ'ল। আলোচনা চলল শ্রমিক নেতার সঙ্গে কোম্পানীর মুখপাত্র ডাঃ চৌধুরীর। এই কারখানা তাঁর তত্ত্বাবধানেই গড়ে উঠেছে। এর সমৃদ্ধির জন্যে প্রাণপাত করেছেন তিনি। কোম্পানী আর ডাঃ চৌধুরী যেন অভেদাত্মা। তাঁর ওপর বিচারের ভার দিয়ে মালিক নিশ্চিন্ত।

ডাঃ চৌধুরী ভাবলেন, শ্রমিক অবশ্যই কিছু পাক, কিন্তু তারা আকাশের চাঁদ চাইলে তা দেওয়া সম্ভব নয়। মালিকের নিমক খাওয়ার তাহ'লে কোন অর্থ হয় না তাঁর পক্ষে। মালিকের দিকটাও বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে।

দিনের পর দিন ইউসুফের সঙ্গে আলোচনা করলেন ডাঃ চৌধুরী। বেতন কিছু বাড়বে, স্থির হল। কি ভাবে বাড়বে, তা নিয়ে শ্রমিকরা যেন মাথা না ঘামায়, এই হল ইউসুফের কথা। মাগ্‌গী ভাতা হিসেবে কোম্পানী যে টাকা বাড়াতে চাইছে, তাতে সকলের সম্মত হওয়া উচিত।

সুজিত-সুভাষ অত বোকা নয়। তারা সমস্ত ডিপার্টমেণ্টে ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের বোঝাতে লাগল, এতে কেউ যেন রাজী না হয়। মূল বেতন বৃদ্ধি হলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুয়িটির সুযোগ পাওয়া যাবে। মাগ্‌গী ভাতা বাড়লে তা হবে না।

সুজিতের নেতৃত্বে শ্রমিকরা আওয়াজ তুললো—মূল বেতন বাড়ানো

হোক। মাগ্‌গী ভাতা নয়। ইউসুফ গিয়ে নালিশ করলো সুজিত-সুভাষের বিরুদ্ধে ডাঃ চৌধুরীর কাছে।

শুনে চোয়াল কঠিন হ'য়ে উঠল ডাঃ চৌধুরীর। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন— I see. আচ্ছা—ঠিক আছে, খবরটা জানিয়ে মস্ত উপকার করেছ তুমি।

ইউসুফ বললো—কিন্তু স্যার, এজন্যে আপনি কিছু ভাববেন না। আমি শ্রমিকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবো।

ডাঃ চৌধুরী বললেন—এ কাজ তোমাকে করতেই হবে ইউসুফ, আমি তোমার ওপর ভরসা রাখি। কোম্পানী বেতন বাড়াতে চাইছে, মাগ্‌গী ভাতাও বেতনেরই অংশ। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে মাগ্‌গী ভাতাও বেতনের অঙ্গ বলে গণ্য হবে। তার ওপর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পর্যন্ত পরে কাটা হ'তে পারে। সরকার পি. এফ. রুলস নিশ্চয়ই চেঞ্জ করবেন; দেখে নিও। এই লাইটে তুমি শ্রমিকদের বুঝিও, তাহ'লেই তোমার কথা তারা শুনবে।

—নিশ্চয় স্যার। তবে কি জানেন, সুজিতবাবু যা বলছেন, সেটা ওরা বেশী লাভের ব্যাপার ব'লে ভাবছে। হাতে হাতে পাওনা। সরকারের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না, কবে কি নিয়ম কানুন বদলাবে। তা সেজন্যে চিন্তা নেই স্যার, ইউসুফ এর একটা বিহিত না ক'রে ছাড়বে না। স্রেফ ভয় ঢুকিয়ে দেব, যদি তোমরা কোম্পানীর অফার মানতে না চাও, তো কোম্পানী এক পয়সা দেবে না। তার চেয়ে খুশী হ'য়ে যা দিচ্ছে—

—যা ভাল বোঝ কর। তাহ'লে এই কথাই রইল। দেখ কি করতে পার তুমি।

—আচ্ছা স্যার।

ইউসুফ চলে যেতেই কলিং বেল টিপলেন ডাঃ চৌধুরী। বেয়ারা এসে সেলাম জানাল। ডাঃ চৌধুরী হুকুম দিলেম—শীলসাহেবকো সেলাম দেও। আদেশ পেয়ে বেয়ারা চলে গেল।

একটু পরেই মিঃ শীল এসে ঢুকলেন তাঁর অফিস ঘরে। পশ্চিম দিকের প্রশস্ত জানালা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ডাঃ চৌধুরী। কপালে চিন্তার রেখা। ঠোঁটে জ্বলন্ত পাইপ।

মিঃ শীল ঢুকে একটু অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে ডেকেছেন স্যার ?

ডাঃ চৌধুরী ফিরে তাকালেন ডাঃ শীলের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন—বিকেলে ফ্রি আছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জরুরী একটা কাজ হাতে আছে ব'লে আমার যাওয়া সম্ভব হবে না, মেট্রোর টিকিট কাটা আছে, অনিতা আর তার মাদারকে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

—আপনি যান না কেন ; কি কাজ ব'লে যান, আমি ক'রে রাখব।

—তোমার দ্বারা সে কাজ হ'লে বলতাম। তা হবে না। মেট্রোয় গিয়ে সিনেমা দেখবে, এতে আপত্তি কিসের ?

—না ; আমি সেজন্যে বলছি না।

—তাহ'লে এই কথাই রইল। সাড়ে তিনটেয় বাংলো যেও। সামনেই গাড়ী অপেক্ষা করবে। আচ্ছা এসো এখন। হাতে কাজ থাকলে সেরে নাও তাড়াতাড়ি।

মিঃ শীল চলে যেতেই আবার বেল টিপলেন ডাঃ চৌধুরী।

—বিশ্বাস বাবুকো সেলাম দেও।

—জী হুজুর।

ষ্টেনোগ্রাফার মিঃ বিশ্বাস আসতেই একটা ডিক্‌টেশান দিলেন ডাঃ চৌধুরী। তারপর একটা শ্লিপ এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই দুজনের নামে অ্যাড্রেস করবেন। বডি অফ্‌ দি লেটার একই থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ বিশ্বাস চিঠি দু'খানা টাইপ করে খামে ভরে ডাঃ চৌধুরীকে এনে দিলেন। ডাঃ চৌধুরী অফিস ছেড়ে চলে গেলেন বাংলোর দিকে।

সন্ধ্যের দিকে কারখানা ঘুরতে বেরিয়ে কর্মরত সুজিত আর সুভাষকে ডেকে নিয়ে গেলেন বাংলোয়। ওদের যত্ন ক'রে বসিয়ে চা পানে আপ্যায়িত করলেন।

তারপর বললেন—দেখ, কর্তব্য কঠিন হলেও আমাকে তা পালন করতে হবে। অনেকের শুভাশুভের দায়িত্ব আমার ওপর। আমার কঠিন না হয়ে উপায় নেই।

কিছুই বুঝতে না পেরে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সুজিত আর সুভাষ। সুজিত জিজ্ঞাসা করল—এ সব কি বলছেন আমাদের? এই কথাই শোনাবার জন্যে আমাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসেছেন?
—দেখ, তোমাদের আমি খুবই ভালবাসি কিন্তু সে অন্য কারণে। যদিও একাজ করতে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, তবু করতে হচ্ছে কর্তব্যের খাতিরে। নইলে কারও রুটি মারার পক্ষপাতী আমি নই। এই নাও তোমাদের চিঠি। আমি তোমাদের দুজনকে বরখাস্ত করলাম। এ ছাড়া উপায় দেখলাম না।
সুজিত জিজ্ঞাসা করল—আমাদের অপরাধ?
ডাঃ চৌধুরী কঠিন স্বরে জবাব দিলেন—শ্রমিকদের খেপাচ্ছ এই অপরাধ।
—অ।

সেদিন সুজিত-সুভাষ বেরিয়ে গিয়েছিল কারখানা থেকে। কাউকে কিছু বলে নি। পরদিন জানাজানি হতেই গোলমাল শুরু হয়ে গেল। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ ক'রে দিলে। ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ জানাল একত্র সমবেত হয়ে। তাদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে কারখানার ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল সেদিন।
শেষ পর্যন্ত ডাঃ চৌধুরীকে মাথা নত করতে হ'ল শ্রমিকদের দাবীর কাছে। মূল বেতন তো বাড়লই, সুজিত-সুভাষের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার ক'রে নিতে হ'ল তাঁকে।
এই পরাজয়ে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ডাঃ চৌধুরী। এই আঘাত

তাঁর বুকে বাজল শেলের মত। ডাঃ চৌধুরী যেন আলাদা মানুষ হয়ে গেলেন। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না।

কারখানার প্রতিষ্ঠার দিন থেকে সেদিন পর্যন্ত ডাঃ চৌধুরী ছিলেন সৃষ্টির নেশায় মেতে। এই ঘটনার পর ভাঙনের খেয়াল চাপল তার মাথায়। শ্রমিকদের ওপর চরম প্রতিশোধ নেবার বাসনা পোষণ করলেন মনে মনে। ভেতরে ভেতরে তৈরী হতে লাগলেন তিনি।

তিনি যে শ্রমিকদের এমন সর্বনাশ করবেন, একথা তারা ভাবতেও পারে নি। ডাঃ চৌধুরী কারখানাটাই কাল্পনিক লোকসানের ভয় দেখিয়ে মালিককে রাজী করিয়ে বিক্রী ক'রে দিলেন এক ডাচ্ কোম্পানীকে। কয়েকশত লোক কর্মচ্যুত হ'ল। অবশ্য তাদের অনেকেই চাকরী পেল বিদেশী কোম্পানীতে।

যাই হ'ক, ডাঃ চৌধুরীর প্রতিশোধ স্পৃহা পরিতৃপ্ত হ'ল শেষ পর্যন্ত। এই ঘটনার পর দেহমন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল ডাঃ চৌধুরীর। ভারতের বনস্পতি শিল্পের একজন পথিকৃৎ এইভাবে হতাশায়, অনু-শোচনায় দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ডাঃ চৌধুরীর সুপারিশে মিঃ শীল কাজ পেলেন এই বিদেশী কোম্পানীতে। শিফট্ ফোরম্যানের পোষ্ট। যা ছিলেন তাই। মাইনে অনেক বেশী। দাপট তার চেয়েও বেশী।

পাছে তাঁর প্রতাপ খর্ব হয়, তাই আগের কোম্পানীর অপর দুই বাঙালী ফোরম্যানের চাকরী পেতে দিলেন না তিনি। তাদের একজন ছিলেন তাঁর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী। মিঃ মিত্র ছিলেন সত্যিকার গুণী লোক। সুন্দর চেহারা ছিল তার। অনিতা মনে মনে তাকেই বেশী পছন্দ করত। মহাকালের রথের চাকার পেষণে কে কোথায় ছিটকে পড়ল। বিদেশী কোম্পানীতে শিফট্ ফোরম্যান নিযুক্ত হল অবাঙালীদের মধ্যে থেকে। মিঃ মিত্র, মিঃ ভট্টাচার্য শূন্য হৃদয়ে ফিরে গেলেন। অনিতার শূন্য হৃদয়ে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করলেন এই ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন বেঁটে খাটো মানুষ মিঃ শীল।

অনিতা চৌধুরী হলেন মিসেস শীল।

সুজিতবাবু আমাকে বিশ্বকর্মা পূজা কমিটির সেক্রেটারী ক'রে দিলেন। পূজার আকর্ষণীয় সূচী হিসেবে থিয়েটারের মহড়া সুরু হয়ে গেল। স্থির হ'ল, বাংলা এবং হিন্দী ছটো নাটক পর পর মঞ্চস্থ হবে। পূজা ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল।

এই সময়েই হরুদার বি. কম. পরীক্ষার ফল বেরুলো। সত্যি কথা বলতে কী, হরুদা যে পাস করতে পারবেন না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। একদিনও তিনি বই ছোঁন নি। কারখানায় বই আনতেন, রাত্রে মোটা বইটা তাঁর বালিসের কাজ করত। একথা তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। তার ওপর ঝামেলা গেছে পরীক্ষার কদিন আগেই। আশ্চর্য এই, হরুদা কিন্তু ঠিক পাস করে গেছেন।

খবরটা শুনে অবাক না হয়ে পারি নি। কি ক্ষুরধার বুদ্ধি হরুদার। মনে হ'ল, ইচ্ছে করলে উনি জীবনে অনেক ওপরে উঠে যেতে পারেন। সেই ইচ্ছেটারই একান্ত অভাব তাঁর।

পার্বতী বউদিকে একদিন কথায় কথায় সেকথা বললাম। তিনি মুচকি হেসে জানালেন—আপনার দাদার ভেতরে যে আগুন আছে, তার উত্তাপ আপনাদের চেয়ে আমি বেশী পাই। বলতে গেলে সেই আগুনের লোভেই ত পতঙ্গ হয়ে ঝাঁপ দিয়েছি।

—তার ফলাফলটা ভেবে দেখেছেন ?

—কিসের ?

—পতঙ্গ হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ?

পার্বতী বউদি ছ'চোখ বিস্ফারিত ক'রে জবাব দিলেন—উপমাটা তা'হলে ঠিক হয় নি, কি বলুন ? আচ্ছা শুধ্‌রে নিচ্ছি—এবার বলি—আমি পুড়ে মরি নি, শীতে জড়োসড়ো মানুষের কাছে একটু আগুনের উত্তাপের মতই আপনার দাদা আমার জীবনের পরম কাম্য হয়ে দেখা দিলেন।

—আগুন আর তার দাহিকা শক্তি তর্কশাস্ত্রে অভিন্ন শুনেছি। হরুদা

আগুনই হোন আর তার উত্তাপই হোন, মোটের ওপর আপনি ঝাঁপ দিয়েছেন এবং পুড়ে মরেছেন—

—আমি আপনার মত অত গ্রামার চিন্তা ক'রে কথা বলতে শিখি নি।

আমি সহাস্যে জবাব দিই—হরুদা একটি লিভিং গ্রামার বিশেষ। শুনেছি, পাঠ্যাবস্থায় বন্ধুরা তাঁর নাম দিয়েছিল নেসফিল্ড। দিনরাত তাঁর কথা ভাবলে আমাদের কথা এক আধবার ভাববার সময় পাবেন কখন ?

—আপনাদের কথা ভাবতে যাব কোন দুঃখে ? আমার ভাববার জন্যে তো আপনার দাদাই রয়েছেন।

—কথাটা খুব আপত্তিকর বউদি।

—কেন ?

—দাদা স্বমহিমায় স্বস্থানে বিরাজ করবেন। সেই কারণে হতভাগ্য দেবরকুল কি বৌদিদের স্নেহের ছিটে-ফোঁটা পেতে পারে না ?

পার্বতী বউদি রণে ভঙ্গ দেন—আপনার সঙ্গে কথায় পাল্লা দেওয়া শক্ত।

কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি মোটেই আলাপী নই। অর্থাৎ চটকদার কথাবার্তা বলা আমার স্বভাব নয়। কথা সাধারণতঃ আমি কম বলি, বেশী শুনি। কিন্তু এও বলি, আমার নিজের হাবভাব দেখে এক এক সময় আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে আমি একটু প্রগল্‌ভ হয়ে পড়ি। কথা বলাটা যে একটা আর্ট। সেকথাটা তখনই বেশী ক'রে মনে হয় ? সেই আর্টে দক্ষতা দেখাবার, দেখিয়ে বাহাদুরি কেনবার ইচ্ছে অবচেতন মনে দেখা দেয়। এমনি ধরনের বন্ধুর সঙ্গে আলাপ সেরে যখন চলে আসি, তখন অবাক হয়ে ভাবি, এত কথা আমি কেমন ক'রে বললাম। এই আমি আর সেই আমি কি এক ?

বিন্দুর কথা মনে পড়ে যায়। সে অপবাদ দিয়েছে, আমি নাকি ভয়ানক গম্ভীর। আমাকে দেখে মনে হয় না। আমি হাসতে জানি। আমি কি

তবে সুকুমার রায়ের কবিতায় বর্ণিত রামগরুড়ের ছানা জাতীয় কোন জীব যাদের হাসতে একেবারেই মানা?
ছবিও প্রথমে সেই কথা বলেছিল। পরে সে তার মত বদলেছিল। হাসিতে ফেটে পড়ে সে বলেছে একদিন—এত হাসাতেও তুমি পারো। সে যাক। বলছিলাম, কথা কমই বলি। অথচ পার্বতী বউদি বললেন,—আপনার সঙ্গে কথায় পাল্লা দেওয়া শক্ত। আশ্চর্য!
সেদিনের সেই ঘটনার পর বিন্দু আর এদিকে মাড়ায় নি। কথাবার্তাও বন্ধ। বিয়েবাড়ীর নিমন্ত্রণে বাড়ীর সকলেই গিয়েছিল, বিন্দু ছাড়া। বিন্দু আমাকে তাদের বাড়ীতে খেতে অনুরোধ করেছে, নিষেধ করেছে বাইরে যেতে। আমি তার কথা শুনি নি।
বিন্দু কি সেজন্যেই কথাবার্তা বন্ধ ক'রে দিল নাকি? এমন তো হওয়ার কথা নয়। সে আমাকে নিজের ভাইয়ের মত দেখে। সেবা করেছে বোনের মত। তার এ অভিমান কেন হ'ল? আমি এ রহস্যের কুলকিনারা খুঁজে পেলাম না।
বিন্দু বার বার আমাকে শুনিয়েছে, সে আমাকে দাদার মত শ্রদ্ধা করে। কেন বলেছে? আমি কি সে কথায় কোন সন্দেহ প্রকাশ করেছি? আমি কি কোনদিন কোন অসতর্ক মুহূর্তে তার সেই বিশ্বাস ভেঙ্গে খান খান ক'রে দিয়েছি? কই মনে ত পড়ে না?
বাসায় ফিরে মনটা কিছুক্ষণ আনচান করে। মনে হয়, বিন্দু আজ আসবেই; চায়ের কাপ হাতে এসে বলবে—চাটা খেয়ে নিন সত্যদা; আমি ততক্ষণ ঘরটা গুছিয়ে দিই। বাব্বাঃ—যে অগোছাল মানুষ আপনি—ঘরটায় একেবারে এক হাঁটু ধূলো জমিয়ে রেখেছেন—নিন, উঠুন—
পর পর বেশ কয়েকটা দিন পার হ'য়ে গেল, বিন্দু এল না।
মনে মনে অস্বস্তি হচ্ছিল। খোঁজখবর নেওয়ার সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতেও কিছুদিন পার হ'য়ে গেল আরও।
শেষে সেদিন গেলাম মাসীমার সংবাদ নিতে। সেটা অজুহাত মাত্র।

উদ্দেশ্য বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করা, কেন সে দাদার মনে অযথা কষ্ট দিচ্ছে?
মাসীমা বারান্দায় তালপাতার পাখায় হাওয়া খাচ্ছিলেন ব'সে ব'সে।
বিন্দু কি যেন সেলাই করছিল ঘরের মধ্যে।
মাসীমা আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—ওরে বিন্দু, সত্য এসেছে, একটা আসন পেতে দে। এসো, সত্য এসো।
মাসীমাকে প্রণাম করে বসতেই তিনি বললেন—কটা দিন খোঁজখবর নিতে পারি নি বাবা। বড্ড ব্যস্ত ছিলাম। বিন্দুকে দেখতে এসেছিল পর পর দু' জায়গা থেকে। এক জায়গায় বিয়ের ঠিক হয়েছে। ছেলে গ্র্যাজুয়েট নয়, ম্যাট্রিক পাস, তবে নিজেদের বাড়ী আছে। চাকরী করে। হেঁকেছেও খুব। দেখি, যাহোক ক'রে পার করি মেয়েটাকে। ঘরে বসে থেকে থেকে বুড়িয়ে যাচ্ছে। এখনো যে ছিরিটুকু আছে, পরে তাও থাকবে না। আর দেরী নয় বাবা।
আমি ঢোঁক গিলে বলি—নিশ্চয়ই মাসীমা—শুভস্য শীঘ্রম। এ তো বেশ সুপাত্র। আজকালকার দিনে যার বাড়ী আছে, মোটামুটি উপার্জন করে, সে তো পাত্র হিসাবে খুবই লোভনীয়। আর দেরী করবেন নামাসীমা। শুভ কাজ সেরে ফেলুন। বিন্দু নিশ্চয়ই সুখী হবে।
মাসীমা বললেন—সেই আশীর্বাদই কর বাবা, মেয়েটা যেন সুখী হয়।
বিন্দু আসন দিয়েই ঘরে চলে গিয়েছিল। আর বার হ'ল না আমার সামনে।
মাসীমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে আমি উঠে চলে এলাম। বিন্দু বলবে আশা করি নি অবশ্য। কিন্তু আশ্চর্য, মাসীমা চা খাবার কথা একবারও বললেন না।
চলে আসতে আসতে মনকে প্রবোধ দিলাম। মেয়ের বিয়ের চিন্তায় আর কোন দিকে খেয়াল নেই মাসীমার।

১২

দেখতে দেখতে বিশ্বকর্মা পূজো এসে গেল।

কদিন আগে স্থির হ'ল, আমরা সবাইকে পেট ভরে লুচি, তরকারী আর বোঁদে খাওয়াব।

পূজাকমিটির সেক্রেটারী হিসেবে আমি মিঃ টেম্পলের কাছে গেলাম একটা বড় টিন বনস্পতি দান করার অনুরোধ জানাতে।

নানান কাজের ঝামেলায় কদিন দাড়ি কামাবার সময় পাই নি। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ঢুকলাম ম্যানেজারের ঘরে।

মিঃ টেম্পল রসিকতা করে তাঁর ভাষাতেই বললেন—আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে যে কোন ভদ্রলোকের ভালরূপে 'শেভ' ক'রে আসা উচিত।

আমি দাড়িতে হাত বুলিয়ে সহাস্যে বললাম—পূজোর ঝামেলায় এত ব্যস্ত আছি যে দাড়ি কামাবার সময় করতে পারি নি স্যার।

মিঃ টেম্পল সস্নেহ দৃষ্টিতে বললেন—আচ্ছা, বুঝলাম। খুব ঘটা ক'রে পূজো করছ তাহলে? যাক্—এখন আমি কি করতে পারি তোমার জন্যে বল শুনি!

—আমরা সবাইকে পেট ভরে খাওয়াব ঠিক করেছি।

—ভেরি গুড্ আইডী ইনডীড্—

মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন—ফাণ্ড পাবে কোথায় এত?

—সে যোগাড় হচ্ছে; আমরা আছি, সাপ্লায়াররা আছে। আমাদের ইচ্ছা। কোম্পানীকেও দরাজ হাতে এগিয়ে আসতে হবে।

মিঃ টেম্পল জিজ্ঞাসা করলেন—কোম্পানীর কাছে কি আশা কর? কালচারাল ফাণ্ডে যা দেওয়া হচ্ছে, তার বেশী এক পয়সা দেবার সাধ্যি নেই আমার।

—টাকার কথা বলছি না স্যার, কয়েনের বদলে চাইছি কাইগুস। মানে একটা বড় বনস্পতির টিন দিন, লোককে লুচি ভেজে খাওয়াই।

—বেশ পাবে।

মিঃ টেম্পলকে এক কথায় রাজী হ'তে দেখে মিঃ ব্রাউন অসন্তুষ্ট হ'লেন মনে মনে। বললেন—কেমন ক'রে দেবে মিঃ টেম্পল? এক্সাইজ যদি অপোজ করে?

—কেন, ওরা নেবে সরাসরি কুলিংরুম থেকে। 'ডিউটির' প্রশ্ন থাকবে না তা'হলে।

—ব্যাপারটা কিন্তু অনুচিত হচ্ছে।

—না, না মিঃ ব্রাউন, এটা একটা প্রথম উৎসব হচ্ছে, নিতে দাও ওদের—

মিঃ ব্রাউন মুখ চোখ লাল ক'রে বললেন—তুমি বললে, আমি সারা ফ্যাক্টরীটাই দিয়ে দিতে পারি—অল্‌রাইট—

মিঃ টেম্পল আমার দিকে চেয়ে বললেন—চিন্তা নেই, পাবে। আর এক কাজ কর। পুকুরে বড় বড় মাছ আছে। জাল ফেলবার ব্যবস্থা কর। সবাইকে মাছ খাইয়ে দাও ঐদিন।

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল মিঃ টেম্পলকে বুকে জড়িয়ে নাচি। যেমন ক'রে শুনেছি, মাইকেল মধুসূদন কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হ'য়ে বিদ্যাসাগর মশায়কে তুলে নেচেছিলনে আনন্দে।

ইচ্ছেটাকে দমন ক'রে বললাম—ধন্যবাদ স্যার। সত্যিই, আপনার সহৃদয়তার জন্যে কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কাজ হাসিল করার আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম। আসবার সময় মনে হ'ল, এই বিদেশী ভদ্রলোকের হৃদয়ে স্নেহ বলে সত্যি কিছু আছে।

'মেনু' আর একটু বাড়ানো হ'ল। ঠিক হ'ল, লুচি, কুমড়োর ছক্কা, মাছের ঝোল এবং বোঁদে খাওয়ানো হবে।

শ্রমিক মহলে প্রতিপত্তিশালী একজন সিনিয়র ফিটার প্রস্তাব করলেন —কুমড়োর ছক্কার বদলে আলুর দম করা হ'ক।

প্রস্তাবটা মনঃপূত হ'ল না আমার। সঙ্গে সঙ্গে বেকুবের মত বলে বসলাম—খরচে কুলোবে না, তাছাড়া মাছের ঝোলে ত আলু থাকছেই। কুমড়োর ছক্কাই তো ভালো।

শুনে সিনিয়র ফিটারের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। আমাকে কিছু না ব'লে চুপ চাপ কাজে চলে গেলেন। গিয়ে ক্ষেপাতে লাগলেন শ্রমিকদের। বলে বেড়ালেন যে আমারা কি ভিখিরী যে যা ইচ্ছে তাই খাওয়াবে? পয়সাটা কাদের? আমাদের না ঐ শালার একার? কি ভেবেছে নিজেকে? ও গ্র্যাজুয়েট বাবু, চেয়ারে বসে কাজ করে, আমরা মুখ্যু, লোহা কেটে হাতে কড়া পড়ে গেছে, আমরা কি মানুষ? আমাদের কথার কি কোন দাম আছে? করুক শালা কুমড়োর ছ্যাঁচড়া —আমরা কেউ খাব না—কত বড় সেক্রেটারী দেখে নিচ্ছি—

ব্যাপারটা ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। শেষে বিশ্বকর্মা পূজো পর্যন্ত বন্ধ হবার যোগাড়।

আমার এ সব ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। ভয়ে মুখ চোখ শুকিয়ে গেল; বুকের মধ্যে শুরু হল কাঁপুনী।

সুজিতবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললাম—কি বিপদেই আমাকে ফেললেন বলুন তো?

সুজিত আশ্বাস দিল—কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, আমি কি করি স্রেফ চোখে দেখে যান। মুখে একটিও কথা বলবেন না। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম—বলেন ত এক্ষুনি সেক্রেটারীশিপ ছেড়ে দিচ্ছি।

সুজিত রেগে গেল—কেন? এই সামান্য ব্যাপারটা যদি মেটাতে না পারলাম, তাহলে এতদিন ট্রেড্ ইউনিয়ন করলাম কি করতে? আপনি চুপ ক'রে থাকুন তো দেখি।

পরের দিন টাইম-অফিসের সামনে ত্রিকোণ-পার্কে সভা ডাকা হ'ল। সভায় একমাত্র বক্তা সুজিত। বলতে গেলে সেদিন সে আদ্যশ্রাদ্ধ করল আমারই। এমনকি আমার পরলোকগত পিতৃপুরুষরাও বাদ

গেলেন না। বার বার সে জোর দিল সম্মিলিত ইচ্ছার ওপর। সকলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা হবে। এটা একটা উৎসব। কল্যাণই উৎসবের প্রাণ। আমাদের উৎসবের মধ্যেই মানব প্রেম, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদির হাতেখড়ি হয়—উৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থই হ'ল সকলের মিলন। এর মধ্যে কোন রাজনীতি নেই।

সকলে এক বাক্যে মেনে নিল, পূজো-কমিটি যা ঠিক করেছে, তাই হবে। মাছের ঝোল যখন হচ্ছেই, তখন কুমড়োর ছক্কা অনাবশ্যক নয়। আমি অবাক হলাম, সুজিতের ক্ষমতা দেখে। এই রকম না হ'লে শ্রমিক নেতা? প্রকাশ্য সভায় সে পিতৃপুরুষ সহ আমার আদ্যশ্রাদ্ধ করল বটে, কিন্তু সেজন্যে আমার এতটুকু রাগ হ'ল না। মনে হ'ল, অবস্থা আয়ত্তে আনতে এটারই প্রয়োজন ছিল।

সবাই খুশী, কিন্তু দেখলাম সেই ফিটার মশায়ের মুখ থেকে থমথমে ভাবটা দূর হ'ল না।

সভার প্রারম্ভে তিনি সুজিতকে বলছিলেন—কেন আপনি ঐ লোক-টাকে এত ইমপরট্যান্স দিলেন বুঝলাম না। যাকে তাকে ধ'রে সেক্রেটারী ক'রে দেওয়ার ঝামেলা এবার পোহান।

সুজিতকে জবাব দিতে শুনলাম—সেজন্যে ভাববেন না। সব মিটে যাবে। পূজো হবে, খাওয়া-দাওয়া, থিয়েটার সব হবে।

দেখলাম, সুজিতের হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপারটা সত্যি সত্যি মিটে গেল। বিশ্বকর্মা পূজোর দিনটা প্রভাত হ'ল ভাল ভাবেই। সারা দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটল। খাওয়ার পাট চুকতে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সন্ধ্যে থেকে নাটক হবার কথা। প্রথমে বাংলা নাটকাভিনয়, তারপর হিন্দী। এগারোটার পরে হিন্দী নাটকের জন্যে মঞ্চ ছেড়ে দিতেই হবে।

দেরীতে আরম্ভ হওয়ার দরুণ বাংলা পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটকের এক-চতুর্থাংশ অভিনীত হতেই এগারোটা বেজে গেল। নাটক তখন দারুণ জমে উঠেছে।

আমি নিয়েছিলাম মোহনলালের ভূমিকা। ঘন ঘন করতালির শব্দে বোঝা যাচ্ছিল, মোহনলালের ভূমিকায় তাদের আনন্দ দিতে পেরেছি। বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি কর্তব্যে অবিচল সেই ঐতিহাসিক বীর চরিত্রের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।

মঞ্চের আশপাশ এবং অডিটোরিয়াম থেকে অবাঙালী সম্প্রদায় গুঞ্জন তুললেন—মঞ্চ ছাড়ো। কিন্তু নাটক হতে তখনো কিছুটা বাকী। কর্মকর্তারা কথাবার্তা চালাতে লাগলেন যদি আপোষে মিটমাট হয়। এ নাটক শেষ হলে যদি শুরু করা যায় পরের নাটক।

ওরা কিছুতেই রাজী নয়। মিঃ পেরেরার কাছে গিয়ে তাদের অভিযোগ জানাল। তিনি মিঃ মুস্তাফিকে দৃঢ়কণ্ঠে হুকুম দিলেন—এগারোটায় ষ্টেজ ছাড়বার কথা, ভদ্রলোকের মত এবার ছেড়ে দাও ওদের।

মুস্তাফি সেদিন একটু লালজল পান করেছিলেন। একটু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন তিনি। মিঃ চাচারও একই অবস্থা। তিনি আমাদের দলে। মুস্তাফি চীৎকার ক'রে বললেন এবং মিঃ চাচা সেটা সমর্থন করলেন—মিঃ পেরেরা, তোমার কি হৃদয় বলে পদার্থ নেই? হলোই বা দেরী, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

ইঞ্জিনিয়ার বললেন—না, না, মিঃ মুস্তাফি, তা হ'তে পারে না। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। ওদের দর্শকরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে। সব চলে যাবে বলছে, তোমাদের নাটক এবার বন্ধ কর।

রাত্রি এগারোটার আগেই মিঃ এণ্ড মিসেস টেম্পল আর মিঃ ব্রাউন চলে গিয়েছিলেন বাংলোয়। মিঃ পেরেরা তখনো যান নি। কাজেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে হ'ল তাঁকেই।

চুল চেরা বিচার। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। মুস্তাফি সে কথা মানবার পাত্র নয়। মুখ চোখ পাকিয়ে, মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বোধ হয় মারতেই যাচ্ছিলেন মিঃ পেরেরাকে। সুজিত তাঁকে নিরস্ত করল। মিঃ পেরেরাকে জানাল—আমি দেখছি যাতে ওরা এক্ষুনি ষ্টেজ পায়।

সুজিত সব কথা এসে আমার কাছে বলল। আর কোন উপায় ছিল না। মঞ্চের ওপর মাইক এনে আমাকে বিদীর্ণবক্ষে ঘোষণা করতে হ'ল—বিশেষ কারণে আমাদের অভিনয় এখানেই বন্ধ করতে হ'ল। আমাদের এই ক্রুটির জন্যে দর্শকদের কাছ থেকে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হবে পরবর্তী নাটক। নমস্কার।

এই ঘটনায় একটা শিক্ষা হয়েছিল আমাদের। বাঙালী এবং অবাঙালী সম্প্রদায়ের সুযোগ সুবিধা পেতে হবে সমান সমান। সেই দিক দিয়ে স্থির হয়েছিল এক বছর হিন্দী নাটক হবে, পরের বছর হবে বাংলা নাটক। এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে সকলেই।

প্রতি বছরেই বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে নাটক অভিনয় হয়েছে। আর একে কেন্দ্র করেই অন্তত একটি পরিবারে কিছুটা অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে।

স্টাফ কোয়ার্টারে সস্ত্রীক থাকেন অবনী ঘোষাল। অত্যন্ত সুপুরুষ। গলাটি বিখ্যাত অভিনেতা দুর্গাদাস ব্যানার্জীর মতো। অভিনয় করতেন চমৎকার। প্রতি নাটকে তিনি নিতেন প্রধান ভূমিকা। বছর চারেক পরে অভিনেতার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দিতে হয়েছিল। ভদ্রলোক যেমন সুপুরুষ, তাঁর স্ত্রী তেমনি কুৎসিৎ দেখতে। মোটা সোটা মহিলার গায়ের রং কয়লাকেও হার মানায়। কিন্তু কি তার প্রতাপ। বজ্র বাঁধনে আগলে রাখতেন স্বামীকে।

একটি নাটকে তিনি সেজেছেন খিজির খাঁ। মতিয়ার ভূমিকায় নেমে-ছেন একদা পেশাদারী মঞ্চের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী। দু'জনে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছেন। তাঁদের অভিনয় দেখে দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধ। অভিনয় শেষে সেই অভিনেত্রী স্বীকার করলেন, মঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে তিনি মতিয়ার ভূমিকায় নেমেছেন, কিন্তু আজকের মত প্রাণ ঢেলে অভিনয় কোন দিন করতে পারেন নি। তার কারণ, খিজির খাঁর অপূর্ব অভিনয় প্রতিভা। মহেন্দ্রবাবুও এমন প্রাণবন্ত অভিনয় করতে পারেন নি।

মহিলার এই প্রশস্তি পল্লবিত হ'য়ে পৌঁছল নিরীহ অবনী ঘোষালের স্ত্রীর কানে। তিনি অভিনয় দেখতে আসেন নি। কোয়ার্টারের মেয়েদের মুখে শুনলেন অনেক কথা। মতিয়ার মৃত্যুর দৃশ্যে যেখানে অনুশোচনানলেদগ্ধ খিজির তার মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখনি দৃশ্যশেষের পর্দা নেমে এল ; মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। ওঁরা দু'জন আর ওঠেন না। লোকে গিয়ে দেখেছে, তখন দু'জনে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ।

অবনীবাবুর স্ত্রী কেঁদে কেটে বুক ভাসালেন। মাথা ঠুকে মাথা ফোলালেন। দিনের পর দিন অনাহারে রইলেন। সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল।

অবনীবাবুব কোন যুক্তিই টেঁকে নি। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে স্ত্রীর জেদের কাছে। অভিনয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন তিনি। স্ত্রীর সঙ্গে কালীমন্দিরে গিয়ে শপথ ক'রে এলেন, জীবনে আর মেয়েছেলের সঙ্গে অভিনয় করবেন না।

নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকমাস পরে চাকরীতে আমাদের একটা ইনক্রিমেণ্ট সমেত কনফারমেশান হ'ল।

এতদিন প্রতিমুহূর্তে ভয়ে ভয়ে থাকতে হ'ত, কখন বুঝি শুনতে হয়, —Your service is no longer required (তোমাকে আর দরকার নেই) চাকরী পাকা হবার পর সে ভয় ঘুচল।

বিশ্বকর্মাপূজোর ঠিক পরেই মিঃ টেম্পলের কনট্রাক্ট পিরিয়ড শেষ হ'ল। কোম্পানী ছেড়ে সস্ত্রীক তিনি দেশে চলে গেলেন। সঙ্গেসঙ্গে মিঃ ব্রাউন আর মিঃ পেরেরাও বদলি হ'য়ে গেলেন। একজন হেডঅফিসে ট্রান্স-পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার হ'য়ে। আর একজন কোম্পানীর উত্তর প্রদেশের কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই। নতুন ম্যানেজাররা এলেন তাঁদের জায়গায়। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বিদায়ীদের অভিনন্দন এবং নবাগতদের স্বাগত জানানো হ'ল এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে।

নতুন ম্যানেজমেণ্টের কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কারখানায় পর পর কয়েকটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

প্রথমে লাগল হাইড্রোজেন প্ল্যাণ্টে আগুন। এগুলো বার্স্ট করলে এই আধা শহরটাই হয় তো শূন্যে বিলীন হয়ে যেত।

ইলেকট্রিকাল ফোরম্যান মিঃ পাকড়াশী পাগলের মত অফিস থেকে চীৎকার করতে করতে ছুটে গেলেন—আগুন, আগুন!

ম্যানেজার থেকে শুরু ক'রে অনেকেই দৌড়ে গেল অকুস্থলে। আকস্মিক বিপদে কারও খেয়াল হ'ল না ফায়ারব্রিগেডে খবর দিতে। সকলের মুখেই আতঙ্কের ছায়া।

আমার মনে হ'ল এক্ষুনি ফায়ারব্রিগেডে খবর দেওয়া দরকার। টেলিফোন তুলে ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁরা ব্যাপারটা শুনেই স্থির কণ্ঠে জানালেন এক্ষুনি আসছেন পুরা ফোর্স নিয়ে।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কাছাকাছি পুকুর আছে?

উত্তর দিলাম—আছে; শুধু পুকুর নয়, গঙ্গাও আছে। তাছাড়া গঙ্গাজলের ট্যাপ আছে কাছাকাছি অনেকগুলো। অফুরন্ত জল পাবেন।

—খুব ভাল হবে তা'হলে।

—দেরী করবেন না কিন্তু।

—না, না। আমাদের বেরুতে দেরী হবে না, পৌঁছতে যা দেরী।

—ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রাখছি, এমন সময় নতুন ম্যানেজার দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। তিনি এসেই কোনও কথা না বলে রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন—ফায়ারব্রিগেড।

তিনিও হাঁপাতে হাঁপাতে দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে আসতে বললেন তাঁদের। কথা শেষ ক'রে আমার দিকে না তাকিয়েই আবার চলে গেলেন।

ফায়ারব্রিগেড নিশ্চয়ই তাঁকে বলেছে, এইমাত্র ফোনে তাঁরা দুর্ঘটনার সংবাদ জেনেছেন। তাঁদের বাহিনী রওনা হ'য়ে গেছে। নতুন

ম্যানেজারের বোঝা উচিত ছিল, আমি আগেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওঁরা চলে যাওয়ার আগে একটা ধন্যবাদ আশা করেছিলাম। কিন্তু নিরাশ হ'তে হ'ল আমাকে। মিঃ টেম্পল হ'লে এ ভুল করতেন না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, এঁরা হলেন আমাদেরই দেশের লোক। ঘরের আপন জনের মত। সেখানে ধন্যবাদের অবকাশ নেই। প্রয়োজনও নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফায়ারব্রিগেড এসে গেল। কয়েক ঘণ্টা ধরে আগুনের সঙ্গে চলল প্রচণ্ড সংগ্রাম। তারপর অবস্থা শান্ত হ'ল।

কারখানার তিনজন কর্মচারী নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে আগুন নেভাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আগুণের সুতীব্র ঝলকানিতে গুরুতর ভাবে দগ্ধ হয়ে যান তাঁরা। একজন যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে ছুটে যাচ্ছিলেন পুকুরের দিকে। জলে ঝাঁপ দিয়ে দাহজ্বালার হাত থেকে রেহাই পেতে। তাকে ঠিক সময়ে ধ'রে ফেলা হয়েছিল বলেই রক্ষা।

এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পরেই আবার এক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এক সিনিয়র ফিটার সুজন সিং। ন্যাটা হাতে কাজ করেন। ওপরে পাইপ লাইনে কাজ করছিলেন। গ্যাসপাইপ 'চোক' হয়ে গিয়েছিল, মেরামত করছিল সুজন। হঠাৎ গ্যাস 'পাস' করতে শুরু করল কি ক'রে বুঝতে পারে নি সে। সামনের প্রপেলারের পাখা বার কয়েক আছাড় মেরে তার ডান হাতের হাড়খানা দু'টুকরো করে দিলে। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে নামানো হল ওপর থেকে।

কোম্পানীর খরচে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি সুজন সিংয়ের। তার সারা শরীরে প্লাষ্টার হল। হাতদুটো রইল উঁচু হয়ে। খড়-মাটির প্রতিমার মতো ; একমেটের সময় যেমন করে বাঁশের ঠেকনো দেওয়া হয়, তেমনি।

হাসপাতাল থেকে সারা শরীরে প্লাষ্টার জড়িয়ে যখন কোয়ার্টারে ফিরে এল সুজন সিং, তার সেই মূর্তি দেখে সবাই চমকে উঠেছিল। তার স্ত্রী বসুন্ধরা কিন্তু এতটুকু কাঁপে নি। আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে সে এই ভাগ্য-

বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল।

আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। সকলের চোখেই শঙ্কিত দৃষ্টি। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকলে।

খুব কাছে থেকে বসুন্ধরাকে সেই প্রথম দেখলাম। সুজনকে সকলের সঙ্গে সেও ধরাধরি ক'রে বিছানায় শোওয়াল। কি কষ্ট বেচারী সুজনের। চোখে দেখা যায় না। এই অবস্থায় তাকে কতদিন কাটাতে হবে কে জানে।

ফ্যান্‌টা ফুল স্পীডে খুলে দিয়ে বসুন্ধরা স্বামীর শিয়রে দাঁড়াল। ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল সারা শরীরে প্লাষ্টার জড়ানো স্বামীর দিকে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকেই দেখছিলাম। এমন অপরূপা সুন্দরী এর আগে কখনো চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না।

কি ভাবছিল বসুন্ধরা স্বামীর দিকে চেয়ে চেয়ে? এমন কঠিন শাস্তি কেন দিলেন ভগবান? কি পাপ করেছে সে?

পঞ্চনদ দুহিতা বসুন্ধরা আর তার রঙীন কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ সুজন সিং। একজন যেন দেবী প্রতিমা, আর একজন যেন দানব। বসুন্ধরার রূপ যেন আগুনের শিখা। সুঠাম, সুন্দরী তন্বী।

সুশান্ত থাকত তাদেরই পাশের ঘরটাতে। তার মুখে বসুন্ধরার অনেক কথাই শুনেছি।

বাবা ছিলেন একজন অধ্যাপক। বসুন্ধরাও শিক্ষিতা। আই.এ. পাস। পাঞ্জাব বিভক্তির অভিশাপ নেমে আসে তাদের পরিবারে। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর পূর্ব পাঞ্জাবে পুনর্বসতি করে তারা।

সুজন সিংয়ের সঙ্গে বসুন্ধরার বিয়ে হয় সেই সময়ে। বড় ফোরম্যান বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছিল সুজন। চেহারায় বন্য হলেও কথা-বার্তায় সে একেবারে চৌকস। কাজেই বসুন্ধরাকে বিয়ে করতে বেগ পেতে হয় নি তাকে।

বিয়ের পর বসুন্ধরা স্বামীর সঙ্গে কারখানার কোয়াটারে এসে সব কথা জেনেছে। তার স্বামী অফিসার নয়, একজন সিনিয়র ফিটার। অর্থাৎ

লোহা ঠেঙাতে হয়। লেখাপড়া কিছুই জানে না। ইংরেজিতে নাম সই করতে পর্যন্ত পারে না।

মনে আঘাত পেয়েছিল বসুন্ধরা। কিন্তু সেজন্যে সে কোন অশান্তি করে নি। দানবপ্রকৃতি সুজন সিং স্ত্রীর মনের নাগাল পাবার ধার ধারত না। ইচ্ছামত দেহ সম্ভোগ করেই সে তৃপ্ত হত। তার স্ত্রী যে কতখানি অতৃপ্তি নিয়ে তাকে দিনের পর দিন সান্নিধ্য দিচ্ছে, সে খবর সে রাখত না।

এই অতৃপ্তির খবর জেনেছিল সুশান্ত। বসুন্ধরা বলেছিল তাকে। সুশান্তর চেহারা ছিল কন্দর্পের মত ; বসুন্ধরার খুব ভাল লেগেছিল তাকে দেখে। তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। মন উজাড় করে দিয়েছিল তাকে।

সুজন সিংয়ের দেহ প্লাষ্টার করা ছিল প্রায় মাস ছয়েক।

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক ভাঙ্গাগড়া চলেছে বসুন্ধরার দেহে মনে। সে প্রাণপণে স্বামীর সেবা করেছে। স্বামীর আরোগ্য লাভের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে দেবতার কাছে। আর যখনই সংসারের প্রাত্যহিক এক-ঘেয়েমির মধ্যে মনে প্রাণে হাঁপিয়ে উঠেছে, তখনই দু'দণ্ড আরামের নিঃশ্বাস ফেলতে ছুটে গেছে সুশান্তর ঘরে।

এমনি করে দিনে দিনে বসুন্ধরা আর সুশান্তর ভেতরে অদ্ভুত এক সখ্যতা গড়ে উঠেছে। নিজেদের অজান্তেই তারা আকৃষ্ট হ'ল পরস্পরের প্রতি।

সুশান্ত একদিন ডিউটিতে এল চমৎকার ডিজাইনের একটা সোয়েটার প'রে। এমনিতেই সুশান্তর চমৎকার চেহারা। গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, দেখতে ছেলেমানুষের মত। বয়স তেইশ-চব্বিশের কম নয়। আকর্ষণীয় চেহারায় টকটকে গোলাপী রংয়ের সোয়েটার পরে ভারী চমৎকার দেখতে হয়েছে তাকে।

টাইম কীপার চক্রবর্তী মুখ পাতলা মানুষ। শ্রমিকদের সঙ্গে যে ভাবে খিস্তি খেউড় করেন, শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। চক্রবর্তী লোক

হিসেবে খুবই ভালো। খুব পরিশ্রমী। কাজে একরত্তি ফাঁকি দেন না। লোকের সঙ্গে বেশ মিষ্টি ব্যবহার করেন। সে তুলনায় মিঃ মুখার্জীর ব্যবহার অমার্জিত। একটু খিটখিটে মেজাজের। বয়সের জন্যে কাজে-কম্মে খুবই ঢিলে। তাঁর ওপর কোম্পানীও সন্তুষ্ট নয়, শ্রমিকরাও তাঁর রুক্ষ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট। কিন্তু কেউ বড় একটা তাঁকে ঘাঁটায় না। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। সবাই মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

মিঃ মুখার্জী সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউন একদিন যথার্থ কথা বলেছিলেন মিঃ চাচাকে। তাঁর কাজে শৈথিল্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন—টাইম-অফিসের সেন্ট পারসেন্ট স্যাটিস্‌ফ্যাক্টরী কাজ করে চকর্‌বর্তী, সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট করে বন্‌ডোপাঢায়া—এণ্ড মুখার্জি ডাজ নাথিং—

সেই চক্রবর্তী সুশান্তকে জিজ্ঞাসা করল—কিরে শালা, কে সোয়েটার তৈরী করে দিল এমন জব্বর ডিজাইনের?

সুশান্ত জবাব দিল—সুজন সিং-এর বউ করে দিয়েছে।

—তোরাই হলি ভাগ্যবান বুঝলি? সোয়েটার বুনে দিচ্ছে, রুমালে ফুল তুলে দিচ্ছে, মাংস রান্না করে খাওয়াচ্ছে, শুনতে পাই বাথরুমে ন্যাংটা করে তোকে নাকি সাবানও মাখিয়ে দেয়?

—কি যে বলেন চক্রবর্তীবাবু!

—শালা, তুই লুকোচ্ছিস কার কাছে? ভেবেছিস, ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না, না? তা বেশ করেছিস। একেই বলে পুরুষের হিম্মত। যা পাস, লুটে নে শালা, অমন জিনিষ বরাতে জুটবে না কোনদিন। তারপর গঙ্গায় চান করে একদিন একটা কনে দেখে তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিস।

একটা শিফ্‌ট শেষ হয়, শুরু হয় আর একটা। চক্রবর্তী যায়, আমি আসি। আমি যাই মুখার্জী আসেন। সেই সময়টাতে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়।

কারখানার পরিবেশে যেটা স্বাভাবিক, তেমনি ধরনের কথাবার্তা শুনি। প্রথম প্রথম শুনতে খারাপ লাগত। কান লাল হয়ে উঠত। মনে মনে

অস্বস্তি বোধ করতাম। জায়গা ছেড়ে উঠে চলে যেতে ইচ্ছে হ'ত। বক্তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা ক'রে বসতাম।

এখন দেখছি, সবই ধীরে ধীরে গা সওয়া হ'য়ে গেছে। হাসি হাসি মুখ ক'রে এ সব কথা আজকাল বেশ উপভোগ করি।

বেশ বুঝতে পারি, কারখানার যান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে আমি জড়িয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ। ভেতরে ভেতরে আমার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কারখানার যন্ত্রগুলো অস্থিমজ্জাসহ গ্রাস করেছে আমার সত্তাকে।

এর থেকে মুক্তির পথ পরে পেয়েছিলাম একদিন। সে পথে শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, সমাজের শ্রদ্ধেয় মানুষদের আনাগোনা। নতুনত্বের মোহে তাঁদের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছিলাম। দেখেছি, তাঁদের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রী এবং ধোপদুরস্ত পোষাকের ভেতরে যে পরিচয় লুকানো আছে, তার সঙ্গে কারখানার অশিক্ষিত আর অমার্জিত রুচির শ্রমিকদের কোনো পার্থক্য নেই।

একথা জেনেই সে পথ থেকে সরে এসেছি মানে মানে।

কিন্তু সে অনেক পরের ঘটনা।

মিঃ দত্ত যে বিবেচক ব্যক্তি হয়ে এমন কাজ করবেন, এ ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর। বন্ধুদের মুখ থেকে সেই আশ্চর্য খবরটা শুনলাম। তাঁরা ছিলেন সেই ঘটনার সাক্ষী।

ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্যে তিনি এক গ্রাজুয়েট যুবতীকে বাড়ীতে রেখেছিলেন। নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করবার কথাও এই সঙ্গে ভেবেছিলেন তিনি। মিঃ দত্তর ভাগ্যদোষে কোনটাই সফল হল না মহিলাকে রেখে।

ভদ্রমহিলার আচার-ব্যবহারে কিছুদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি। মহিলার প্রণয়ী নিয়মিত আসত দেখা করতে। মিঃ দত্তের খরচেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা হ'ত তার।

সেটা হয়ত উপেক্ষা করতেন মিঃ দত্ত, যদি মহিলার ব্যবহারে কিছুটা

তাঁর সাম্বনা থাকত। ছুটির দিনে বাড়ীতে থাকতেন মিঃ দত্ত। ভাবতেন আজকে অন্ততঃ প্রণয়ী যুবক প্রেম নিবেদন করতে ধাওয়া করবে না তাঁর বাড়ী পর্যন্ত। নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করবেন মহিলার সান্নিধ্যে। এক সঙ্গে আহার করবেন; গল্প করবেন; ছেলেমেয়েদের সকলকে নিয়ে বেড়িয়ে আসবেন কাছাকাছি কোথাও। দক্ষিণেশ্বর অথবা বেলুড়ে।

মিঃ দত্তের ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যেত। ছুটির বারেও মহিলার প্রণয়ী ঠিক আসত। তার সঙ্গে সারা দুপুর হাসি ঠাট্টায় কাটাত মহিলা। বিকেলে তাঁর অনুমতি নিয়ে দুজনে চলে যেত সিনেমায়।

সেজেগুজে এসে বলত—আপনি ত বাড়িতে রয়েছেন আজ, একটু ঘুরে আসি তা'হলে? যা নাছোড়বান্দা লোক, সিনেমায় না নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন না কিছুতে। তা'হলে যাই, কেমন?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ দত্ত বলেন—আচ্ছা।

বাধা দিতে পারেন না তিনি। তাঁর সামনে দিয়েই তাঁরই খরচে প্রসাধন সেরে বেরিয়ে যেতেন মহিলা। তারপর নিঃসঙ্গ মিঃ দত্ত ছটফট করতেন এক অসহ্য ব্যথায়। সারা দুপুর ওদের বিশ্রম্ভালাপ, উচ্ছ্বাসের হাসি তাঁর দেহে মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত। মনে হত, শীগ্‌গীর এর একটা বিহিত করতে হবে তাঁকে। নইলে তিনিও হয়তো পাগল হ'য়ে যাবেন। বিহিত তিনি করলেন শেষ পর্যন্ত। মিস্‌ট্রেসকে বিদেয় করলেন তাঁর পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে।

ছেলেমেয়েদের দিলেন আবাসিক বিদ্যালয়ে। বহু প্রতিষ্ঠানে এজন্যে তিনি চিঠি লিখেছেন। তাঁকে অফিসে বসে দিনের পর দিন গাদা গাদা চিঠি লিখতে দেখেছি।

প্রত্যেক জায়গা থেকে থাকা খাওয়ার খুঁটিনাটি খবর জানলেন মিঃ দত্ত। প্রস্‌পেক্‌টাস আনালেন। তুলনা ক'রে দেখলেন, খরচের অনুপাতে কোথাকার ব্যবস্থা কতখানি ভাল। তারপর অন্তরঙ্গ দু'একজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, ছেলেমেয়েদের কোথায় দেবেন। তাদের

ব্যবস্থা ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লেন মিঃ দত্ত।

এরপর একেবারে ঝাড়া হাত-পা। স্ত্রী মানসিক হাসপাতালে। ছেলে-মেয়েরা আবাসিক বিদ্যালয়ে থাকে। তিনি শুধু টাকা দিয়েই খালাস। কিন্তু আগেকার চেয়ে তাঁর অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে উঠল। এতদিন ছেলেমেয়েরা ছিল কাছে; দুঃখের মধ্যে একটি সান্ত্বনা ছিল। একে-বারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দুদিনেই হাঁফিয়ে উঠলেন তিনি।

অফিস থেকে মাসখানেক ছুটি নিলেন মিঃ দত্ত। একখানা ঘর বাদে গোটা বাড়ীটাই ভাড়া দিয়ে তিনি গেলেন মধুপুর বেড়াতে।

মিঃ দত্তের জীবননাট্যে এইখানেই নতুন অঙ্কের সূত্রপাত হ'ল।

মধুপুরের মধুবৃন্দাবনে হঠাৎই তিনি জীবনসঙ্গিনী পেয়ে গেলেন। মধুপুরে থাকতে থাকতে আলাপ হ'ল এক মহিলার সঙ্গে। মহিলা এম. এ. পাশ। কনভেণ্টে পড়ান। মধুপুরে নিজেদের বাড়ী আছে। মহিলার সাহয্যেই তিনি একখানা ঘর পেয়েছিলেন তাঁদের বাড়ীর কাছাকাছি। মহিলার নাম মাধুরী সরকার।

মাধুরী সরকার মিঃ দত্তকে বলেছেন—আমার বোন এসেছে বেড়াতে, নইলে আমাদের বাড়ীতেই থাকতে পারতেন।

মিঃ দত্ত শুনে হেসেছেন—আপনার বোন চলে গেলে তাহলে একখানা ঘর পেতে পারি, কি বলেন?

—স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আমার বোন তিনটি মাস না থেকে যাচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে খরচ খরচা করে এসেছেন শরীর সারাতে।

—তাহ'লে তো কথাই ওঠে না।

মাধুরী সরকারের বাড়ীর সামনে দিয়েই দু'বেলা যাতায়াত করেন মিঃ দত্ত। প্রত্যহ দেখা-সাক্ষাত হয়। কোনদিন তাঁদের বাড়ীতে যান। জলযোগ সেরে দুজনেই বেড়াতে বার হয়ে পড়ে কোন কোনদিন। বেড়াতে বেড়াতে দুজনের পরিচয় হয়। মাধুরী সরকারকে নিজের পারিবারিক সব কথাই খুলে বলেন মিঃ দত্ত। শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন চল্লিশ বছরের কুমারী মাধুরী সরকার। তবু নিজের মনটাকে সম্পূর্ণ

মেলে ধরেন না।

কয়েকদিন মেলামেশার পর মিঃ দত্ত দেখলেন তিনি নিজের সব কথা বলেছেন মিস সরকারকে। তাঁর কথা তো কিছুই জানতে চান নি? সেদিন বেড়াতে বেড়াতে সেকথা জিগ্যেস করলেন তিনি। শুনে মিস সরকারের চোখে একটি বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলতে লাগলেন তিনি। তারপর একটা নির্জন জায়গা দেখিয়ে বললেন —আসুন, বসি এখানে।

দুজনে সামান্য দূরত্ব রেখে মুখোমুখি বসলেন। একজনের সব থাকতেও ভয়ানক নিঃসঙ্গ। আর একজন নিঃসঙ্গতাকেই বেছে নিয়েছেন ইচ্ছে করে। মাধুরী সরকার বসে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। বসন্ত-বাতাস উতলা হ'য়ে ছুটোছুটি করছে তাঁদের চারিপাশে। বাতাসে ভেসে আসবে পাশের বসরাই গোলাপ বাগিচা থেকে সুমিষ্ট গন্ধ। মিস সরকারের প্রসাধনের গন্ধের সঙ্গে মেশানো গোলাপের সুমিষ্ট ঘ্রাণ নিতে নিতে মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন—কই, বলছেন না যে কিছু?

মাধুরী হাসলেন একটু। বললেন—কিই বা বলার আছে?

—কিছুই কি বলার নেই? বিয়ে করতে কি আপত্তি ছিল আপনার?

—আপত্তি ছিল নিজের দিক থেকেই।

—কেন?

—বিয়েটা আমার কাছে অন্ততঃ মনে হ'ত আত্মবিক্রয়ের সামিল।

—এখনও তাই মনে হয়?

মিঃ দত্তের এই প্রশ্নের জবাব সহসা দিতে পারলেন না মিস সরকার। একটু ভেবেচিন্তে বললেন—ঠিক সে রকম মনে হয় না। প্রকৃতির বিধান মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ, এই রকম মনে হয় আজকাল।

—তাহ'লে মেনে নেন নি কেন?

—একবার মনস্থির করেছিলাম। আমার ভগ্নিপতিই একটা সম্বন্ধ এনেছিল। কথাবার্তা এগিয়েছিল অনেকদূর। বিয়ের দিনক্ষণও পাকা হ'য়ে গিয়েছিল।

—তারপর ?

—বিয়েটা হ'ল না শেষ পর্যন্ত।

—কেন ?

—পাত্রের সম্বন্ধে যে খোঁজ খবর পাওয়া গিয়েছিল, পরে জানা গেল, তা সব ধাপ্পা। আমি বেঁকে বসলুম। আমার মাও জোর করলেন না আমাকে।

—অ।

এরপর একটা কথা বলবার জন্যে কয়েকদিন ধরে ছটফট ক'রেছেন মিঃ দত্ত। প্রত্যহ একই সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে বলি বলি করেও বলতে পারেন নি।

এদিকে তাঁর ছুটি ফুরিয়ে আসছিল। সপ্তাহ খানেক মাত্র বাকী।

সেদিন সাহস ক'রে কথাটা বলেই ফেললেন মিঃ দত্ত। 'বললেন—কিছু মনে করবেন না মিস সরকার। একটা কথা খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই।

—বলুন।

—আমার কথা সবই শুনেছেন। আপনার কথাও শুনেছি। বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে আমার এবং আপনার ইচ্ছেটায় কিছু বিরোধ দেখি না। অবশ্য পছন্দ অপছন্দর কথা তুলতে পারেন। আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব করলে আপনি হয়ত আমাকে স্বার্থপর ভাবতে পারেন। কারণ, আমার অনেকগুলি লায়াবিলিটি আছে, আপনার যা আছে সবই এ্যাসেট। এখন বলুন দেখি, কি আপনার মনের কথা ?

—এর জবাব এত সহজে দেওয়া যায় না। তবে এটুকু বলতে পারি—ওসব হিসেব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।

—অর্থাৎ আপনি রাজী তা'হলে ?

—বুঝে নিন।

—আমি আমার সুবিধেমত অর্থ টাই বুঝে নিলাম।

পঁয়তাল্লিশ বছরের মিঃ গুণময় দত্ত চল্লিশ বছরের সুন্দরী কুমারী মাধুরী

সরকারের পাণিগ্রহণ করলেন।

মিঃ দত্ত টেলিগ্রাম ক'রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর তিন ঘনিষ্ঠ সহ-কর্মীদের। তারা কাউকে না জানিয়ে মধুপুর গিয়েছিল। রেজেষ্ট্রিবিবাহে সাক্ষী ছিল তারা। চুপ চাপ প্রীতিভোজ সেরে তারা ফিরে এসেছিল। ঘুণাক্ষরে কাউকে জানতে দেন নি ঘটনাটা।

বিয়ের ছ'মাস পরে কথাটা আমার কানে আসে। মিঃ দত্ত পুনরায় বিয়ে করেছেন গোপনে। পাত্রী উচ্চ শিক্ষিতা। কনভেণ্টে পড়ান। বয়স হ'য়েছে রূপসীও নন। তাঁর প্রয়োজন ছিল একজন পুরুষের; মিঃ দত্তর প্রয়োজন ছিল একজন নারীর। তুজনের প্রয়োজন মেটাতে সানন্দে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা।

শুনে মিঃ দত্তর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি। সত্যিই, তাঁর চেহারার পরিবর্তন চোখে পড়ল। বয়স যেন অনেকটা কমে গেছে তাঁর। চেহারায় জেল্লা দেখা দিয়েছে। মিঃ দত্ত যেন নবজীবন ফিরে পেয়েছেন।

মনে মনে একটা জ্বালা অনুভব করি আমি। হয়ত তাঁর অবস্থা ঠিক বোঝবার মত শক্তি ছিল না আমার। ভুক্তভোগী ছাড়া এ কথা অন্যে বুঝবেই বা কী ক'রে।

আমি শুধু এক তরফাই ভেবেছি। মিঃ দত্ত বিবাহিত। তিন ছেলেমেয়ে তাঁর। স্ত্রী বিকৃতমস্তিষ্ক। কি প্রয়োজন ছিলতাঁর আবার বিয়ে করার? খবরটা শুনে তাই হকচকিয়ে গেলাম। খুব তুঃখ হ'তে লাগল। ঘৃণা বোধ করতে লাগল মিঃ দত্তের সম্বন্ধে। মনে হ'ল, তাঁর হৃদয়ে স্নেহ ব'লে কোন বস্তু নেই। অসুস্থা স্ত্রীর কথা ভেবে, সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে আর বিয়ে করাই উচিত ছিল না তাঁর পক্ষে।

আমার মনের এই ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছিল মিঃ দত্তের প্রতি একটি প্রশ্নে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি আবার বিয়ে করলেন কোন মুখে মিঃ দত্ত?

মিঃ দত্ত কঠিন স্বরে জবাব দিলেন—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ

কথা বলুক, এটা আমি পছন্দ করি না।

আমার মনে হ'ল, মিঃ দত্তর জবাবটা একটা থাপ্পড়ের মত আমার গালে এসে পড়ল। আমার মুখ থেকে দ্বিতীয় কোন কথা বার হ'ল না।

বছর দেড়েক বাদে মিঃ দত্ত নিজে থেকেই আমাকে তাঁর বাড়ীতে একদিন আমন্ত্রণ জানালেন।

গেলাম তাঁর সঙ্গে। দেখলাম, এ পক্ষের একটি ছেলে হয়েছে মিঃ দত্তর। তাঁর আগের পক্ষের ছেলেমেয়েরা নতুন মাকে পেয়ে, নতুন একটি ভাইকে পেয়ে মহাখুশী।

মিঃ দত্তের সংসারে যিনি খুশীর বাতাস এনেছেন, দেখলাম তাঁকেও। তাঁর মিষ্টি হাতের ছোঁয়া লেগে সব কিছু সজীব হয়ে উঠেছে।

সেদিনই মিঃ দত্তের মুখে শুনলাম মাধুরী সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আর মিলনের কথা। সব কথা বলে মিঃ দত্ত প্রশ্ন করলেন—এবার বলুন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে আমি কি অন্যায় করেছি?

স্বীকার করতে হ'ল, তিনি কোন অন্যায় করেন নি। আইনের দিক থেকেও নয়, মানবিকতার দিক থেকেও নয়।

নিজের পারিবারিক জটিল সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান করেছেন তিনি বিয়ে ক'রে।

মিঃ দত্তের ওপর আমার বিরূপ মনোভাব দূর হল সেদিন থেকে।

১৩

যেহেতু আমার মা-বাবা বেঁচে নেই, মামা-মামীমাও আমাকে ম্যাট্রিক পাস করিয়ে খাওয়ানো পরানোর দায়িত্বের সঙ্গে স্বেচ্ছায় অভিভাবকত্ব ত্যাগ করেছেন, সেই কারণে আমাকে কেউ বলার ছিল না, বিয়ে করো। অথচ এই আষাঢ় মাসে আমি ছাব্বিশে পা দিলাম।

ছবি ম্যাট্রিক পাস করেছে। ওর সম্পর্কে আমাকেও হরুদার মত কম-

প্লিমেণ্ট দিতে হ'চ্ছে। ছবি সত্যিই হীরের টুকরো মেয়ে। ওর পড়বার আগ্রহ দেখে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা দেখে, রুগ্ন বাবাকে দেখা আর ভাইদের মানুষ করার সঙ্কল্প শুনে সত্যিই ভালো লেগেছে আমার।

এ সব দায়িত্ব কোনদিন আমার কাঁধে চাপে নি। আমার ইদানীং ইচ্ছে হ'ত ছবিকে বলি—ছবি, তোমার দায়িত্বের খানিকটা আমাকে দাও। একা তোমার পক্ষে এতখানি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

শুনে ছবি নিশ্চয় একথার অর্থ বুঝতে পারবে না। হয়ত বলবে—আমাদের জন্যে আপনি অনেক করেছেন। তাই ব'লে কি চিরদিন আপনাকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেব? তা হয় না।

না, ছবি সে রকম মেয়ে নয়। দুর্বল হৃদয়া নয় সে। এক আশ্চর্য ধাতুতে গড়া যেন। এতদিনের সান্নিধ্যেও কোনরকম বাচালতা দেখলাম না তার মধ্যে।

ছবির দৃঢ়তা মুগ্ধ করল আমাকে। সত্যি কথা বলতে কী, আমি দুর্বল হ'য়ে পড়ছিলাম।

সেদিন ছবিকে কলেজে ভর্তি করাতে গিয়েছিলাম। কাজ সেরে ফেরার পথে ব'লে বসলাম—চলো ছবি, একটা সিনেমা দেখে আসি।

ছবি ইতস্ততঃ করলো একটু; তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল—কিন্তু ফিরতে যে দেরী হয়ে যাবে? ওষুধ খাওয়াতে হবে বাবাকে। সকাল সকাল রান্না না সারলে ভাইয়েরা ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমুলে ওরা আর উঠতে চায় না। সে আর একদিন হবে।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন ক'রে বললাম—তাই হবে।

ট্রেনে ফেরার পথে ভাবছিলাম, অতএব কি কর্তব্য? কর্তব্যপরায়ণা ছবিকে বধূ হিসেবে পেলে সুখী হতাম নিশ্চয়। কিন্তু ছবি তার বাবাকে ছেড়ে, ভাইদের ছেড়ে অন্য সংসারে যাবে না। অন্ততঃ যতদিন ভাইয়েরা মানুষ না হয়। সে কতদিন?

ছবি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চেয়েছিল আমার মুখের পানে। আমি চাইতেই

দৃষ্টি নত ক'রে সে জিজ্ঞাসা করল—আপনি রাগ করলেন ?

মনে মনে চমকে জিজ্ঞাসা করি—কেন ?

—আপনার অবাধ্য হ'লাম ব'লে ?

কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে জবাব দিলাম—না।

জবাব শুনে নিশ্চিন্ত হ'ল ছবি। প্রসন্নমুখে চেয়ে রইল জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে।

আমি কিন্তু সতর্ক হ'লাম। ছবির সঙ্গে আমার শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্ক। মনে প্রাণে এই কথাটিই বিশ্বাস করে ছবি। এর বেশী কিছু নয়। তাই সে প্রাণপণে চেষ্টা করে এসেছে আমার বাধ্য হতে। তাকে যা 'টাস্ক' দিয়েছি, ঠিক ক'রে রেখেছে; একবার যা বলেছি, ঠিক তা মনে রেখেছে। আজ সে সিনেমা দেখার প্রস্তাবে সায় দিতে পারে নি কারণ তার মন পড়ে আছে রুগ্ন বাবার জন্যে, মাতৃ-হারা ভাইগুলোর জন্যে। ছবি ভেবেছে, শিক্ষকের অবাধ্য হলাম; ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করেছে। ছবি তা'হলে শিক্ষক ছাড়া আর কিছু আমায় ভাবতে পারে না ?

আমি জোর ক'রে মনের দুর্বলতা দূর করলাম। কামনা জানালাম, ছবি অনার্স গ্রাজুয়েট হ'ক। শিক্ষকতা ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আমাকে ছবির আর প্রয়োজন হবে না।

সুশান্তকে একদিন নিরিবিলিতে পেয়ে মনের মধ্যে চাপা কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

চক্রবর্তী সেদিন যা ইঙ্গিত করল, তার পেছনে কোন সত্য আছে কি ?

বসুন্ধরাকে দূর থেকে দেখেছি, কারখানার ভেতরে পার্কে, গঙ্গার ধারে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে। কোয়াটার থেকে সস্ত্রীক কেউ কেউ বিকেলের দিকে বায়ুসেবন ক'রে যান। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেই এ সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

টাইম-অফিসের সামনেকার ত্রিকোণ পার্কটি পরে পরিণত হল চিলড্রেন পার্কে। সেখানেও ছেলেমেয়েদের হাত ধ'রে কেউ কেউ আসেন

দেখেছি।

বসুন্ধরাকে দেখে একটি উপমাই মনে পড়েছিল ; আগুনের শিখা। দেখে মনে হয়েছে, অত্যন্ত গরবিনী সে। সামনে মানুষ থাকলেও তার সুন্দর চাহনিতে ধন্য করে না তাকে। সে জানে, তার পেছন পেছন অনেক জোড়া লুব্ধ দৃষ্টির তীর সর্বাঙ্গে নিক্ষিপ্ত হ'চ্ছে। চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে সেটা উপেক্ষা করে চলে গেছে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে। সুজন সিং-এর দুর্ঘটনার পর তাকে আর আসতে দেখা যায় নি। তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন চক্রবর্তীর রসিকতা শোনার পর থেকে বসুন্ধরার চিন্তাটা সারা মন জুড়ে বসল। অনেক চেষ্টা করেও তার কথা মন থেকে দূর করতে পারলাম না।

মানুষের মনের রহস্য বোঝা ভার। পঞ্চনদ দুহিতা বসুন্ধরার সঙ্গে সুশান্তর বয়সের তফাৎ সামান্যই। পীনোন্নত পয়োধরা, দীর্ঘাঙ্গিনী বসুন্ধরার পাশে মনে মনে বসাতাম সুশান্তকে। মনে হ'ত যেন ছোট ভাই। কি মধুর ভাই-বোন সম্পর্ক। বাংলার ভাইকে স্নেহ করে পঞ্চ-নদের দেশের মেয়ে ; তাকে আদর করে ; ভালমন্দ জিনিষ খাওয়ায়, সোয়েটার বুনে দেয়। এর মধ্যে বিসদৃশ কিছু থাকতে পারে না। তথাপি চক্রবর্তী সেদিন অমন বিসদৃশ কথা বলল কেন ?

সুশান্তকে একা পেয়ে ডাকলাম। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম —চক্রবর্তী সেদিন যা বলল, আপনি তার প্রতিবাদ করলেন না কেন ?

সুশান্ত বলল—বলতে দিন ওকে। মুখ খারাপ করেই ও আনন্দ পায়। তবে চক্রবর্তী লোক হিসেবে খুবই ভাল। আমি তো আগের কোম্পানী থেকেই ওকে দেখছি।

—আমি হ'লে কিন্তু বরদাস্ত করতাম না। এর মধ্যে শুধু আপনি জড়িত নন, একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এরকম রসিকতা ভদ্রতা-বিরোধী। তাই নয় কি ?

কোনও যুবক প্রেমপত্র পেলে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দেখাবেই দেখাবে। নারীর ভালোবাসা পেলে পুরুষ গর্ববোধ করে। সে কথা বন্ধুর কাছে

ব'লে আনন্দ পায়। এ অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। সহপাঠী বন্ধুদের কারও কারও কাছ থেকে তাদের বান্ধবীদের প্রেমপত্র পড়েছি; কেউ কেউ শুনিয়েছে বৈধ, অবৈধ প্রেমের কাহিনী। গোপন কথা অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে ফাঁস করে তারা যেন কৃতার্থ হয়েছে।

সুশান্তও তার ব্যতিক্রম নয়। আমার প্রশ্নে সে একটু বিচলিত হ'ল মনে মনে। বোঝা গেল, তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। আমাকে সব কথা বলবে কিনা। শেষে সেই বিশেষ মানসিক অবস্থারই জয় হ'ল। সুশান্ত জবাব দিল—আপনি বন্ধু বলেই বলছি, কথাটা গোপন রাখবেন; চক্রবর্তীর কথায় প্রতিবাদ করার মুখ নেই আমার।

—তার মানে?

—বুঝলেন না? যার কথা বলছেন, সেই মহিলা সত্যি সত্যি আমার প্রতি আসক্ত।

—আপনি ভুল করছেন সুশান্তবাবু। আপনাকে তিনি স্নেহ করেন, যত্ন-আত্তি করেন নিজের ভাইয়ের মত। আপনি সেটাকে ভুল চোখে দেখেছেন। লোকের কথা শুনে সেটাকেই আসক্তি বলে মনে করেছেন আপনি।

—ভুল আমি করি নি সত্যবাবু। প্রথম প্রথম আমি সেটাই মনে করতাম। কিন্তু ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কটা একদিনের ঝড়ে উড়ে গেল। যেমন ক'রে ঝরা পাতা উড়ে যায়। দেখলাম, আকণ্ঠ পিপাসায় সে ছটফট করছে। তার কাতরতা আমার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিলো। আমাকে নিয়ে দিনরাত মেতে উঠল সে। ছোট ছেলেমেয়ে খেলনা পেলে যেমন কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না, তেমনি। জানেন ত, বাঘিনী একবার রক্তের স্বাদ পেলে কেমন হিংস্র হ'য়ে ওঠে। ওর সেই হিংস্রতার আমি নিত্য শিকার।

শুনে আমি নির্বাক। লোকচক্ষুর অন্তরালে জগতে কত অঘটন ঘটে চলেছে। আগুনের ধর্মই এই। সে পোড়াবেই। নিজের আওতার মধ্যে যাকে পাবে তাকেই।

আমার কাছ থেকে যাবার আগে সুশান্তবাবু আবার স্মরণ করিয়ে দিল—এ সব কথা পাঁচজনের কানে তুলবেন না।

আমি তার কথা রাখলেও কথাটা গোপন থাকে নি।

যথাসময়ে প্লাষ্টার মুক্ত হ'ল সুজন সিং। কাজে যোগদান করল। কমপেনসেসন সেই মোটা টাকা। মহা খুশী হ'ল সে। হাত তার আগের মতই জোড়া লেগেছে।

বসুন্ধরা নিজে একদিন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল। আর তাইতেই কথাটা ফাঁস হ'য়ে গেল সকলের কাছে।

সুশান্তর বিয়ের দেখাশোনা চলছিল। মেয়েও দেখা হ'য়েছে দু' একটা। তেমন পছন্দসই মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না। আসলে পছন্দই হচ্ছিল না সুশান্তর। কারখানার কয়েকজন নিজেদের জানাশোনা মেয়েদের জন্যে চেষ্টা ক'রে শেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

এ খবর কানে গেল বসুন্ধরার। শুনে সে ক্ষেপে গেল। সুশান্তকে হাতের কাছে পেতেই তার চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিলে বারকতক। ঠাস ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলে গালে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—বেইমান কাঁহাকা—সাদি করেগা তুম? হাম ছোড়েগা তুমকো? যাঁহা যায়েগা, হাম যায়েগা তুমারা পিছে পিছে—

এই ঘটনা সারা কারখানার মানুষকে মুখর ক'রে তুলল। সবাই হাসে মুখ টিপে টিপে। এরপরও বাঘিনীথাবা মারতে চেষ্টা ক'রেছে বারকয়েক। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ক্ষেপিয়েছে সুজন সিংকে।

সুজন চাকু শানিয়ে বলেছে—হাম গর্দান লে লেগা শালাকো --

সুশান্তর তখন জীবন-সংকট।

ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় ব্যাপারটা মিটেছিল শেষ পর্যন্ত। দগদগে ক্ষতটার ওপর দেওয়া হ'ল 'ও কিছু নয়' জাতীয় অমোঘ মলমের প্রলেপ।

এ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজমেণ্ট বারকতক রদবদল হ'ল।

একজন এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট গেলেন, আর একজন এলেন। যিনি যান, ছ' একজন ক'রে স্টাফ কমিয়ে প্রমোশন নিয়ে যান।

এই রকম ক'রে বারো-চোদ্দ জন স্টাফ বদলি হ'য়ে গেল বিভিন্ন ইউনিটে। এক একজনার ঘাড়ে ডবল কাজ চাপান হ'ল। টাইম অফিস থেকে মিঃ চাচা গেলেন। আমি বদলী হ'লাম বিল সেকসনে। রইল কেবল চক্রবর্তী আর মুখার্জী। ছ' শিফটে ছুজন টাইমকিপার। একজন কামাই করলে অপরে ওভারটাইম ক'রে কাজ তুলে দেয়।

হরুদা তখন কোম্পানীর অল ইণ্ডিয়া ফিগার। কোম্পানীর সর্বভারতীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ম্যানেজারও তাঁকে সমীহ ক'রে কথা বলেন।

সেই সময়ে এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট একমাসেব ছুটিতে গেলে হরুদাকে তাঁর জায়গায় এ্যাকটিং করতে দেওয়া হ'ল। হরুদা হ'লেন আপনাদের 'বস্'।

পার্বতী বউদিকে সেই সময় একদিন গিয়ে বললাম—হরুদা এখন আমাদের 'বস্', শুনেছেন?

পার্বতী বউদি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তার মানে?

—ও, হরুদা বুঝি আপনাকে কিছু বলেন নি?

—না ত, কি ব্যাপার?

—কেমন লোক দেখেছেন? আমি হ'লে বউকে তো বটেই, পাড়াপড়শীকে ব'লে বেড়াতুম, জানো, আমি অমুক কোম্পানীর এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট?

—ও, বুঝেছি। কিন্তু আপনার দাদা তো সে ধরণের মানুষ নন ভাই। আপনি যেটাকে ছুর্লভ সম্মান ব'লে ভাবছেন, সেটা ওঁর কাছে তেমন কিছু নয়। সেরকম ভাবলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে জানিয়ে তার অংশ দিতেন। তবে হ্যাঁ, একটা কথা উনি প্রায়ই আমাকে বলেন, চাকরী ভালো লাগছে না।

এই সময়ে পরিচারিকা বিস্কুট আর চা দিয়ে গেল। বউদি বললেন—নিন, চা খান।

চা খেতে খেতে বললাম—পরের দাসত্ব করাটা হরুদার মত লোকের

জন্যে নয় বউদি। হিসেব করলে দেখা যাবে, উনি কোনো কোম্পানী-তেই এক বছরের ওপর কাজ করেন নি। এই কোম্পানীতেই রেকর্ড ব্রেক করেছেন। আমাদের কাছে এটা রীতিমত একটা বিস্ময়।

পার্বতী বউদি সহাস্যে বললেন—দায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন হয়।

—আচ্ছা বউদি, উনি যে আপনাকে প্রায়ই বলেন, চাকরী ভালো লাগছে না। একথা শুনে আপনার কি মনে হয়েছে?

—কি আবার মনে হবে? কিছুই না।

—আপনি কি একবারও বলেন নি, চাকরী ছেড়ো না। অমন ভালো চাকরী—

—কেন বলতে যাব বলুন? চাকরী ছাড়লে কিছু একটা করবেনই। স্বাধীন ব্যবসা করলে মন্দ কি? ওঁর যা বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব, তাতে ব্যবসা করলে অনেক বেশী উপার্জন করতে পারতেন। তাছাড়া অনেকগুলো লোকের চাকরী দিয়ে অন্নের সংস্থানও ক'রে দিতে পারবেন। আমার মনে হয়, ওঁর ইচ্ছেটাও সেই রকম। আর এতে আমার যথেষ্ট সমর্থন আছে।

—ব্যবসায়ে অনেক বেশী পরিশ্রম আর রিস্ক নিতে হয়। মানুষকে এক্সপ্লয়েট করার আর্ট শিখতে হয়, চাকরীতে এ সব ঝামেলা নেই।

—আছে বৈকি। চাকরীতে যাঁরা উঁচুতে, তাঁরা কি সাবোর্ডিনেটদের দস্তরমতো এক্সপ্লয়েট করেন না? না করলে তাঁদের উঁচুতে ওঠাই হয় না, পত্তন হয় নীচে। চাকরীতে যাঁদের উচ্চাশা নেই, তাঁদের কথা আলাদা। Happy life কবিতায় যাঁদের কথা বলা হ'য়েছে, এঁরা হলেন তাই। No hope to rise nor fear to fall.

—আপনি আমাকে সেই দলে ফেলতে পারেন বউদি।

—তা ত পারলাম না ভাই।

—কেন বলুন তো?

—আপনিই একদিন সেকথা বলেছেন। সত্তর টাকাকে সাতশো টাকায়

পরিণত করার আশা আপনার আছে। এটা অবশ্যই সফল হবে আপনার ; কেননা, আমি জানি, কাজ আপনি ভালোবাসেন। আমার বাবা বলতেন, love the work and the work will love you.

—আমার আশা যদি কোনদিন সফল হয়, সেদিনও ভুলব না বউদি, সেটা হরুদার দয়াতেই সম্ভব হয়েছে।

—দয়া কেন বলছেন ভাই, এতো মানুষের কর্তব্য। তাছাড়া ভুলবেন না, চাকরী পাওয়ার কৃতিত্বটা আপনারই, উনি উপলক্ষ্য মাত্র।

—আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বউদি। ভেতরে একজনের ব্যাকিং না থাকলে চাকরী পাওয়া যায় না।

—সে যাক্, একটা কথা বলি, রাগ করবেন না ?

—না, না, স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, একটা কেন, একশোটা।

পার্বতী বউদি সহাস্যে বললেন—এখনও কি আপনি বিয়ে করার মত উপার্জন করেন না ?

আমি একটু থেমে জবাব দিই—গড়পড়তা ছা-পোষা মানুষ যে আয় করে আমিও হয়ত তাই করি। কিন্তু আমার চালচুলো নেই বলেই হয়ত কোনো অনূঢ়া কন্যার বাপ-মা আমার পেছনে লাগেন নি।

অর্থাৎ ইচ্ছেটা ষোল আনা আছে তাহ'লে ?

—আছে। ঘটকালি করবেন নাকি ?

—আপনার বিয়ের ঘটকালি করতে হবে আর একজনকে ? মনের মত সঙ্গিনীর খোঁজ পান নি এখনও ?

—কই আর পেলাম। যাক, এবার উঠি বউদি।

—আচ্ছা আসুন।

কয়েকমাস পরে পার্সোনেল অফিসার মিঃ ভাট অন্য এক ইউনিটে বদলি হয়ে যান। হরুদাকে ফ্যাক্টরী ম্যানেজার নিজে ডেকে বলেন—মিঃ গাঙ্গুলী, তুমি দরখাস্ত কর। আমি রেকমেণ্ড করছি।

তিনি জবাব দিয়েছেন—আমি ঐ পদের জন্য লালায়িত নই।

—কেন, তুমি তো ঐ পদে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার মিঃ গাঙ্গুলি ; এটা জুনিয়র ম্যানেজমেণ্ট পোষ্ট। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা কি ঠিক ?

—পোষ্টটা না হয় পেলাম ; কিন্তু কারখানার এতগুলো লোকের ভালবাসা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে হারাতে হবে।

—কেন ?

—কারণ পার্সোনাল অফিসার হওয়া মানেই শ্রমিকদের শত্রু আর মালিকের পেটোয়া হওয়া। জুনিয়র ম্যানেজমেণ্টে প্রমোশন পাওয়া মানে গোলামির ফাঁস আরও শক্ত ক'রে গলায় নেওয়া। আমার উন্নতিতে কাজ নেই।

হরুদার মুখে পরে এসব কথা শুনেছি। শুনে তাঁকে বলেছি—এমন সুযোগ হারানো আপনার উচিত হয় নি।

হরুদা তাঁর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে দিলেন যেন—থামোতো হে ছোকরা ; কদিন এ্যাকটিং করেই আক্কেল হয়ে গেছে আমার, আর নয়।

শুনে আমি অবাক হ'য়ে যাই। হরুদার এই এক অদ্ভুত খেয়াল। সুযোগ হাতে পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করেন না। নিজের বক্তব্যের সমর্থকে যে যুক্তি দেখালেন সেটাই কি সত্যি ? জীবনে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অমানুষ হওয়াটা কি অত্যাবশ্যক ? উচ্চপদে আসীন ব্যক্তি কি শ্রমিক, কেরাণী-দের আন্তরিক ভালবাসার অধিকারী হতে পারেন না ?

কারখানার কর্মজীবনে যতই নতুন নতুন অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ততই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। একজন মানুষকে সব চেয়ে বেশী শোষণ করার চিন্তা ছাড়া আর কিছু তাঁদের মধ্যে দেখি নি। আর তখনই মনে হয়েছে, হরুদার যুক্তির সারবত্তা ছিল কতখানি।

এ কথা যখন বুঝতে শিখেছি, ততদিনে হরুদা কোম্পানীর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছেন। তিনি তখন লক্ষপতি ব্যবসায়ী। বহুলোকের অন্ন-দাতা।

১৪

সেদিন স্টাফ কোয়াটারের দিকে তাকাতেই দেখি, তেতালায় নিজেদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মিসেস অনিতা শীল। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন কারখানার ভেতরে ম্যানেজমেণ্ট বাংলোর দিকে।

আমার মনে হ'ল, অনিতা ওদিকে চেয়ে কী ভাবছেন, নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারি। নিশ্চয় তিনি ভাবছেন, ভাগ্যের কি পরিহাস। কারখানার ভেতরে ঐ বাংলোর একটি ফ্ল্যাটে কেটেছে তাঁর স্বপ্নরঙীন জীবনের অনেকগুলি দিন। কারখানার ম্যানেজার ডাঃ চৌধুরীর কন্যা তিনি। আজ সেখানে তাঁর স্থান নেই। চাকরীর পদবীতে তাঁর স্বামীর কৌলিন্য নেই বলে তাকে বাস করতে হ'চ্ছে কারখানার বাইরে স্টাফ কোয়াটারে।

হয়ত মিসেস মেটার সৌভাগ্যে ঈর্ষাবোধ করছেন অনিতা শীল। মিঃ মেটা আগের কোম্পানীতে ছিলেন শিফ্‌ট ফোরম্যান। সস্ত্রীক থাকতেন এই স্টাফ কোয়াটারে। তিন তিনটি পুত্র সন্তান তাঁর। মিসেস মেটা কারখানার ভেতরে যেতেন স্বামীর সঙ্গে। অনিতাকে দেখে সমীহ করতেন কত। তাঁর সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলতেন শীতকালে। অন্য সীজ্‌নে তাস অথবা কেরাম।

তখন মিঃ মেটার উপার্জন ছিল সামান্য। খুবই সাদাসিধে থাকতেন। মিসেস মেটা ঝি-চাকর রাখতে দেন নি স্বামীকে। নিজেই থালাবাসন মাজতেন, রান্নাবান্না করতেন।

এই নতুন কোম্পানীতে মিঃ মেটার চড় চড় ক'রে পদোন্নতি হয়েছে। জুনিয়র থেকে সিনিয়র ম্যানেজমেণ্ট। স্টাফ কোয়াটার থেকে উঠে গেছেন ম্যানেজমেণ্ট বাংলোয়। গাড়ী আছে, খানসামা, বাবুর্চি আছে। ছেলেরা পড়ছে ভারতের নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

মিসেস মেটার গড়ন সুন্দর, ছিপছিপে। তাঁর দেহের চাকচিক্য বেড়েছে বহুগুণে। মূল্যবান পোষাক আর প্রসাধনে তাঁকে খুবই অল্পবয়স্ক দেখায় মিঃ মেটার পাশে। অবশ্য দুজনের বয়সের ব্যবধান একটু বেশীই হবে। মেম সাহেবের কাছে ইংরেজী শিখেছেন মিসেস মেটা। কেতা-দুরস্ত হয়েছেন সাহেবীআনায়।

আর অনিতা চৌধুরী হ'য়েছেন অনিতা শীল। ম্যানেজমেণ্ট বাংলো থেকে এসেছেন স্টাফ কোয়াটারে। তাঁর দুটি সন্তান হয়েছে। একটি পুত্র একটি কন্যা। দেহে প্রচুর মেদ হ'য়েছে তাঁর। সেই সতেজসৌন্দর্য হারিয়েছেন মিসেস শীল। সংসারের চাকায় আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে-ছেন নিজেকে।

মেটা-দম্পতি ছেলেদের দূরে সরিয়ে ঝাড়া-হাত-পা হ'য়ে কেমন ক্লাব, পার্টি, সিনেমায় ঘুরে বেড়ান কোম্পানীর গাড়ীতে ক'রে। অনিতা শীলের জীবনে সে সুযোগ নেই এখন।

ম্যানেজমেণ্ট বাংলোর দিকে চেয়ে এসব কথাই ভাবছেন হয়ত অনিতা শীল।

আমি অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। পিঠে কার হাতের স্পর্শ পেতেই চমকে উঠলাম। ফিরে চেয়ে দেখি কান্তিবাবু। প্রোডাক্সান ডিপার্টমেণ্টের একজন অপারেটর। উনিও সপরিবারে স্টাফ কোয়াটারে থাকেন; নীচের তলায়। লোক হিসেবে প্রায় চক্রবর্তীর সগোত্র। কান্তিবাবুও লোক খারাপ নন, কিন্তু মুখে কোন কথাই বলতে বাধে না। একটু পেট-পাতলা লোক তিনি।

পানের ছোপ ধরা দন্তপাতি বিকশিত ক'রে কান্তিবাবু হাসলেন। প্লাণ্ট থেকে দোতলার অফিস-টেরাসে এসেছিলেন ধূমপান করতে। একটা বিড়ি ধরিয়ে টান দিয়ে বললেন—ওদিকে তাকাবেন না মশাই; পরস্ত্রীর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতে নেই। বিশেষ ক'রে আপনাদের মত আইবুড়ো কার্তিকদের।

লজ্জিত হ'য়ে বলি—না, আমি কিছু দেখছি না ত!

কান্তিবাবু বললেন—আহা দেখুন, দেখুন। আপনারা চরিত্রবান, পুণ্যাত্মা লোক। চোখে দেখেই চরিত্র ঠিক রাখতে চেষ্টা করুন।

—কি বলছেন আপনি?

—অফিসে ঘাড় গুঁজে চাকরী ক'রে যান মশাই, খবর তো কিছু রাখেন না। যাঁর স্ত্রীর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই শোনেন নি?

—কেন কি হয়েছে মিঃ শীলের?

—আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। অথচ টি টি পড়ে গেছে এ নিয়ে।

অনুমানে বুঝলাম, রহস্য আছে কান্তিবাবুর কথার মধ্যে। তা'হলে কি কোন রকম মনোমালিন্য হয়েছে শীল-দম্পতির মধ্যে? অনিতা শীলকে তাই অমন উদাস দেখাচ্ছিল? আমি এতক্ষণ যা ভেবেছি, সবই ভুল? ব্যাপারটা জানবার জন্যে কৌতূহল হ'ল। বললাম—ব্যাপারটা কি শুনি?

—এ সব দেবা-দেবীর ব্যাপার মশাই, না শুনেছেন ভালো করেছেন। দরকার কি ওসব নোংরা কথা শুনে?

—তা'হলে শুনে কাজ নেই। যাই কাজ আছে—

আমি জানতাম, একথা শোনার পর কান্তিবাবুর পেট ফুলতে সুরু করবে ঘটনাটি ফাঁস করবার জন্যে। উনি এতক্ষণ চার ফেলে আমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছিলেন। আমি তার ধারে কাছে না ঘেঁসতে হতাশ হ'লেন তিনি। ভেবেছিলেন, ঘটনাটি শোনার জন্যে আমি একটু সাধাসাধি ক'রব। তখন নাছোড়বান্দা শ্রোতার কাছে যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি সব কথা বলবেন।

আমি যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলাম; উনি খপ ক'রে হাতখানা ধ'রে ছোপ ধরা দাঁতগুলো বার ক'রে বললেন—কি মশাই, চলে যাচ্ছেন যে, শুনেই যান ব্যাপারটা—

বাধা পেয়ে বলি,—কাজ আছে, পরে না হয়—

কান্তিবাবু বললেন—আরে রাখুন তো দেখি কাজ; সারাদিন ঘাড় গুঁজে গাধার মত খেটেই চলেছেন, কি লাভ হ'চ্ছে বলুন তো? আর যারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের দেখুন। মোটা মোটা ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছে। ও সব কায়দা জানতে হয় মশাই—

—যাক, আপনি কি বলবেন, শেষ করুন তাড়াতাড়ি।

—হ্যাঁ পথে আসুন এবার। বুঝলেন মশাই, কত্তাটি আজকাল কেঁচে গণ্ডুষ করতে আরম্ভ করেছে।

—তার মানে?

—মানে,—ঘরে বউ থাকতে, তুটো ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে একটা আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা করা কি ঠিক?

এরপর ধৈর্য ধরে শোনার ঠিক ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এই এক দোষ আমার। কান্তিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে যে চলে যাব, সেটাও পারলাম না। দেখা হ'লেই দূর থেকে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করেন আমাকে। বলেন, কেন জানিনে,—আপনাকে দেখলেও আনন্দ হয়। অবশ্য এটা ঠিক, কারখানার প্রতিটি লোকের সঙ্গেই আমার অন্তরঙ্গতা আছে। সকলেই ভালবাসেন আমাকে। দরখাস্ত লেখার দরকার হ'লে ছুটে আসে আমার কাছে। শ্রমিকদের কেউ কেউ আসে মনিঅর্ডারের ফরম লেখাতে। কোঅপারেটিভের লোনের ফরম লেখাতে। কাজে ব্যস্ত থাকলেও তারা এলে না ক'রে দিয়ে পারি না। নইলে ওরা মনে মনে তুঃখ পাবে। যে ভালবাসাটুকু পাই ওদের কাছে,সেটুকু হারাব হয়ত। কান্তিবাবুর সামনে থেকে চলে এলে উনি হয়ত তুঃখ পাবেন। লজ্জা পাবেন তার চেয়েও বেশী। একই কারণেই তাঁর সামনে অফিস-টেরাসে দাড়িয়ে তাঁর কথাগুলো শুনতে হ'ল আমাকে।

কান্তিবাবু ব'লে গেলেন—ওঁর স্ত্রী যদি খাঁটি বঙ্গললনা হ'তো, তাহ'লে মশাই হয় চোখ বুজে দেখে যেত, রা কাড়ত না মোটে, না হয় মাথাটাথা ঠুকে রক্তারক্তি করত অবনী ঘোষালের বউয়ের মতো। কিন্তু মহিলার শরীরে জার্মান রক্ত বইছে কিনা, স্বামীকে শোধরাবার পদ্ধতিই তাঁর

আলাদা। আর এতে কাজও হয়েছে অব্যর্থ। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

আমি তখনো তাঁর কথার কোনো মর্মোদ্ধার করতে পারি নি। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—আপনি বড্ড হেঁয়ালী ক'রে কথা বলেন।

কান্তিবাবু দাঁত বার ক'রে হেসে বললেন—আপনি শিক্ষিত মানুষ, যা বললাম, কিছুই বোঝেন নি? নাঃ—আপনি নেহাৎ ছেলেমানুষ।

—তা হবে; এখনও কিছু বাকী আছে না শেষ হয়েছে?

—আপনি তো কিছুই বোঝেন নি। তাহ'লে খোলসা করেই বলি ব্যাপারটা। পাকড়াশীবাবুর মেয়েটা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে, দেখতেও বেশ ডব্‌কা গোছের; মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত রূপ মশাই। তার সঙ্গে একটু যেন বাড়াবাড়ি রকমের মাখামাখি করছিলেন শীলবাবু। এসব কি আর লুকোছাপা থাকে মশাই? আমাদের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় কঠিন।

—এ অসম্ভব কান্তিবাবু, আমি বিশ্বাস করি না।

—আমার কথা বিশ্বাস না হয়, কাউকে জিগ্যেস করলেই বুঝবেন আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি।

—আমার দরকার কি? পাশাপাশি কোয়াটার; নড়বার চড়বার জায়গা বলতে ঐ কোয়াটারটুকু। যদিই বা মিঃ পাকড়াশীর মেয়ে প্রতিবেশী ভেবে মিঃ শীলের কোয়াটারে যাতায়াত ক'রে থাকে, তাতেই তুনিয়া রসাতলে গেল? মিঃ শীল হ'য়ে গেলেন লম্পট পুরুষ মানুষ? ছিঃ, আপনাদের মনটা—

কান্তিবাবু রেগে গেলেন আমার কথায়—থামুন মশাই, যা জানেন না, তা নিয়ে কথা বলতে আসবেন না। এলে গেলে দোষ দিচ্ছে কে? কিন্তু মনে করুন, কোয়াটারে শীলবাবু একলা, ফ্যামিলি কেউ নেই, রাত্তির বেলা একা একা মেয়েটা যেতেই দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল, এটা কেমন দেখায়?

—খারাপটা কি দেখায়? দরজা তো সব সময়েই সকলের বন্ধ থাকে

দেখেছি!

—আর কত্তা নাইট ডিউটি গেলে রাতদুপুরে যদি গিন্নির কাছ থেকে পাকড়াশীবাবুর বড় কার্ত্তিকটি বেরিয়ে আসে, তাহ'লে কোয়াটারের লোকগুলোর মন্দ ভাবতে দোষ কি মশাই ?

—এটা হ'লো ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারা প্রকৃত সত্য না জেনে মিছিমিছি কাদা ছেটাতে যান কেন ? এসব কুৎসা রটিয়ে তারাই মজা পায়, যাদের চরিত্রে এই রকম গলদ কোথাও কিছু আছে। রাগ করবেন না, কথাটা ঠিক আপনাকে লক্ষ্য ক'রে বলি নি। আচ্ছা অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, এবার আমি আসি কান্তিবাবু।

কান্তিবাবুর কাছ থেকে চলে এসে নিজের সীটে গিয়ে বসলাম দারুণ এক বিতৃষ্ণা নিয়ে। কুৎসা এঁদের কাছে বড় মুখরোচক। এতটুকু সূত্র পেলেই এঁরা পেটুকের মত তা গিলতে থাকেন। বিষাক্ত খাদ্য খেলে যেমন বদহজম হয়, তেমনি এঁরাও কুৎসার কথা পেট থেকে বার না ক'রে স্বস্তি পান না।

সেদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়েছি পোষাক না বদলেই। কান্তিবাবুর কথাগুলো মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না শত চেষ্টা ক'রেও। হেঁয়ালি ক'রে তিনি কথা বলছিলেন ; মিসেস শীলের শরীরে জার্মান রক্ত বইছে। স্বামীকে শোধরাবার ভিন্ন রকম পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন তিনি। অনিতা এতখানি নীচে নেমে যেতে পারেন, এযে বিশ্বাস করাও শক্ত। তাঁর চোখের সামনে মিসেস মেটা ক্রমশঃ ওপরে উঠছেন, আর তিনি নিজেকে টেনে নামিয়েছেন নীচে। কিন্তু কেন ? হতাশায়, ক্ষোভে, দুঃখে ?

মিসেস মেটার ওপরে ওঠাও যেমন বনস্পতি কারখানার কল্যাণে, মিসেস শীলের নীচে নামার মূলেও তেমনি এই কারখানা। তার বিষাক্ত আবহাওয়া। এই আবহাওয়া কাউকে ওপরে তুলে দিয়েছে, কাউকে নামিয়েছে নীচে। নীচে নামলে যেটা গায়ে লাগে তার নাম কাদা ;

ওপরে উঠলেও কিছু একটা গায়ে এসে লাগে। তখন সেটা আর কাদা থাকে না, তা হয় চন্দন।
মিঃ মেটা যে চড়্ চড়্ ক'রে ওপরে উঠলেন, সে কি তাঁর একার কৃতিত্ব? এতে মিসেস মেটার কৃতিত্বও খানিকটা ছিল বইকি!
মিঃ টেম্পলের পরে কারখানার ম্যানেজার হ'য়ে এসেছিলেন মিঃ বলবন্তরাও। কোম্পানীর এই প্রভাবশালী ব্যক্তিটি ছিলেন পরিচালন দক্ষতায় যেমন চৌকস, ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি রোমান্টিক।
মোটামুটি চেহারাটাও তাঁর শ্রীমণ্ডিত। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী মিঃ বলবন্ত রাও ছিলেন একজন ভালো স্পোর্টসম্যান। কারখানায় তিনিই তৈরী করেন ফুটবল গ্রাউণ্ড। তাঁর উদ্যমেই কোম্পানীর একটি সুযোগ্য ক্রিকেট টীম গড়ে ওঠে। ক্রিকেট এবং ভলি ম্যাচ হ'তো স্থানীয় স্পোর্টস ক্লাবগুলোর সঙ্গে। সবদিক দিয়েই মিঃ বলবন্ত রাও ছিলেন প্রাণবান পুরুষ।
মিসেস মেটার পাতলা, দীর্ঘ চেহারা তাঁর কেমন মনে ধ'রে গেল। তাঁর সঙ্গে ব্যাডমিন্টন আর ইনডোর গেমস খেলেই তৃপ্ত হতেন না বলবন্ত রাও। নৌকা বিহার করতেন তাঁকে নিয়ে। চাঁদনী রাতে বলবন্ত রাওয়ের কোলে মাথা রেখে গুন গুন ক'রে গান গাইতেন মিসেস মেটা। চন্দনের মত সুরভিত ক'রে রাখত তাঁর দেহমন বলবন্ত রাওয়ের বলিষ্ঠ স্পর্শ।
কখনও তাঁরা একসঙ্গে যেতেন বাইরের ক্লাব পার্টিতে। ড্রিঙ্ক করতেন তুজনে। গাড়ী করে ফেরার পথে সারা পথ থাকতেন ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। ড্রাইভারের উপস্থিতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না তাঁরা।
মিঃ মেটা স্টাফ থেকে জুনিয়র এবং জুনিয়র থেকে সিনিয়র ম্যানেজমেণ্টে প্রমোশন পেলেন। নির্দিষ্ট সময় পরে বলবন্ত রাও চলে গেলেন কোম্পানীর সব চেয়ে বড় কারখানার ম্যানেজার হয়ে। মিঃ মেটা ম্যানেজার হ'লেন।
মিসেস মেটা পার্টিতে নাচতে শিখেছেন। ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন

অনর্গল। ছেলেদের ব্যয় সাধ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিয়েছেন লেখাপড়া শিখতে। প্রৌঢ় মিঃ মেটার পাশে তন্বী যুবতী হ'য়ে তিনি ঘুরে বেড়ান ফ্লাওয়ার গার্ডেনে। দূর থেকে দেখে মনে হয়, একজোড়া প্রজাপতি যেন ফুলের মধু পান ক'রে বেড়াচ্ছে।

দেখে বোঝাই যায় না, এই মিসেস মেটাই মাত্র কয়েক বছর আগে নিজের হাতে বাজার করেছেন, বাসন মেজেছেন, রান্নাবান্না ক'রে খাইয়েছেন স্বামীপুত্রকে।

বিছানায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল আরও কত কী ভেবে যেতাম, কে জানে। হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়ল। পাশের জানলা দিয়ে দেখছি, ছবি আসছে। অনেকদিন দেখা হয় নি তার সঙ্গে। প্রত্যহ তাদের বাড়ী যাবার অভ্যেসটা অনেক চেষ্টায় দমন করেছি; ছবিকে দেখবার জন্যে কয়েকদিন ধ'রে মনটা আকুলি বিকুলি করেছিল। মনটাকেও শাসন করেছি কঠিন হ'য়ে। বুঝেছি, পাত্র হিসেবে, ছবির কাছেও আমি মূল্যহীন।

হঠাৎ কি কারণে ছবি আসতে পারে, বুঝতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম তাকে—এসো, এসো! সোজা কলেজ থেকে বুঝি?

ছবি চেয়ারে বসে বলল—হ্যাঁ। আপনার একেবারে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, ব্যাপার কি? আর একদিনের জন্যেও বুঝি মাড়াতে নেই? বাবা ভেবেই সারা—আপনাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। সময় ক'রে একদিন গিয়ে দেখা করতে অসুবিধে হবে?

আমি অবাক হ'য়ে ছবির মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ছবি আরও সুন্দর দেখতে হ'য়েছে। আরও স্মার্ট হ'য়েছে আগের চেয়ে। কথা বলছে গড় গড় ক'রে। আগে একটি কথায় শেষ করতে পারলে দুটি কথা বলত না ছবি; এখন যেন অনেকটা সহজ হ'য়েছে সে। কলেজী শিক্ষার ফলেই হ'য়েছে এটা।

জবাব দিলাম—আগে যেতাম তোমাকে পড়াতে। এখন তার প্রয়োজন

নেই, কাজেই যাই না।

—বাঃ, তাই ব'লে একদিন আধদিন যেতে নেই? আপনি বোধ হয় ভেবেছেন, আমাদের মন ব'লে একটা বস্তু নেই?

—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবার কথা প্রায়ই ভাবি। হ'য়ে ওঠে না।

—এত কি কাজ?

—আবার পড়াশুনো করছি। দেখি, যদি প্রাইভেটে এম. এ. পাস করা যায়। তাই আর বড় একটা কোথাও বেরুই না। কারখানা আর ঘর করছি; যে অসিতদার স্টুডিওতে একদিন না গিয়ে থাকি নি, সেখানেই যাওয়া হয় নি অনেকদিন।

—আপনি পড়ছেন শুনে বাবা খুবই আনন্দ করবেন।

—তাঁর শরীর কেমন যাচ্ছে আজকাল? উঠে হেঁটে বেড়ান?

—শরীর আগের চেয়ে খারাপ যাচ্ছে। কেবলই বলেন, কলসীর জল ফুরিয়ে এল, কি হবে?

—কলসীর জল? তার মানে?

—পাশ বইয়ে যে টাকা ছিল, তুলতে তুলতে শেষ হ'য়ে এসেছে। পেন্সনের টাকায় সংসার কষ্টে শিষ্টে চালাতেই হয়, ওষুধ কিনতে আর ডাক্তারের ভিজিট দিতে কুলোয় না। মাসে মাসে জোর ক'রে বাবাকে দিয়ে তোলাই।

—জোর ক'রে কেন?

—তিনি বলেন, আমার জন্যে কেন অনর্থক টাকাগুলো নষ্ট করি? ওগুলো যে—

বলতে বলতে ছবি থেমে যায়। আমি চেয়ে দেখি তার মুখ চোখ আরক্ত হ'য়ে উঠেছে। বুঝতে কষ্ট হয় না, ছবির বাবা কী উদ্দেশ্যে টাকাগুলো পাশ বইয়ে সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন। ছবির বিয়ের জন্যে তোলা টাকায় নিজের চিকিৎসা চালাতে তাই মন চায় না জগমোহনবাবুর। আমি বুঝতে পেরে অন্য প্রসঙ্গ তুলি—অনেকদিন বাদে তোমাকে

দেখলাম, তার ওপর এসেছ আমার বাসায়, শুধু মুখে তোমাকে ফেরান উচিত নয়। কিন্তু কি ক'রে অতিথি সৎকার করি বল দেখি? ঘরে যে একখানা বাতাসাও নেই। একটু বসবে? চট্ করে আমি আসছি—

ছবি সলজ্জ ভাবে বল্ল—না, না, তার দরকার নেই—আমি এবার যাই।

আমি জেদ ধরলাম—না, বসতেই হ'বে তোমাকে, আমি যাব আর আসব—

চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ তাকে মিষ্টি খাওয়ানোর ইচ্ছে হ'ল আমার। কারণটা নিজেই ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছবি সোজা কলেজ থেকে এসেছে বলেই কি? কিম্বা তাকে কিছুক্ষণ আমার কাছে আটকে রাখার ইচ্ছে?

মনে মনে মতলব এঁটেছি কতবার, জগমোহনবাবুকে গিয়ে বলব, ছবিকে বিয়ে করতে চাই আমি। আপনার যদি অমত না থাকে তা'হলে শুভ-কাজ মিটিয়ে ফেলুন। মানুষের শরীর গতিকের কথা কিছু বলা যায় না।

ছবির কলেজে পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে ওদিকে মাড়াই নি। নিজেকে জোর ক'রে সরিয়ে নিয়েছি। মনটার ওপর এজন্যে জবরদস্তি করতে হয়েছে। একটু নিরালায় বসলেই মন ছুটে যেত ছবিদের বাড়ীতে। ছবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আঁকু পাকু করত মন। তবু যেতাম না। এক একটা দিন পার হ'ত, আর ভাবতাম, আমার চেষ্টা সার্থক হ'য়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধতা ক'রে দুঃখও পেতাম যেমন, আনন্দও পেতাম তেমনি। আমার মনে হ'ত, দেখাসাক্ষাতের অভাবই আমার আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলবে। ছবির প্রতি আমার একতরফা ভালবাসা আরও নিটোল হ'য়ে উঠবে।

আর একটা কথাও ভেবেছি। এই অদর্শন হয়তো ছবিকে আমার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। তার মনের হদিস পাব হয়তো। দেখতে পাব, তার মনের কুঁড়িগুলি পাপড়ি মেলেছে।

আজ ছবির হঠাৎ উপস্থিতিতে তার মনের নাগাল পেয়ে গেছি, এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারব না। খুব চাপা মেয়ে। মনের মধ্যে অতল গভীরতা। আমার এম. এ. পড়ার সংবাদে সে খুশী হয়েছে, একথা বলে নি। বলেছে, বাবা শুনে খুশী হবেন। ছবি কিছুতেই নিজে থেকে ধরা দেবে না। তাকে ধরতে হবে আমাকেই।

আমার বাসায় তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখার ইচ্ছাতেই তাকে মিষ্টি খাওয়াব ব'লে চলে এসেছি। উপায় থাকলে আর কাউকে দিয়ে খাবার আনিয়ে নিতাম। সেই সময়টুকুও কাটত ছবির সান্নিধ্যে। তাকে একলা বসিয়ে রেখে আমাকে খাবার আনতে ছুটতে হ'ত না।

খাবার নিয়ে ফিরে দেখি ছবি আমার বিছানায় আধ-শোয়া অবস্থায় একখানা মাসিকপত্রের পাতা ওল্‌টাচ্ছে। আমাকে দেখে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে উঠে বসল। আমি শালপাতায় খাবার সাজিয়ে ছবির সামনে ধরলাম।

ছবি জিজ্ঞাসা করল—আপনার ?

—আছে ; তুমি খাও। তোমাকে জল দিই।

জল গড়িয়ে নিয়ে দুজনে খেতে শুরু করলাম।

ঠিক সেই সময় মাসীমাকে আসতে দেখলাম। ঘরের মধ্যে ছবিকে দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—মেয়েটি কে সত্য ?

হঠাৎ আমি ব'লে বসলাম—আপনার ভাবী বউমা মাসীমা।

ছবি চমকে আমার দিকে তাকাল।

মাসীমা মুখখানা সহজ ক'রে বললেন—খাসা মেয়ে, তা বিয়ে হ'চ্ছে কবে ?

—ওর যেদিন ইচ্ছে।

—বেশ, বেশ, তাড়াতাড়ি সিঁদূর পরিয়ে ঘরে নিয়ে এস বাছা, মনের মিল হ'য়েছে যখন, আর দেরী করা ঠিক নয়। তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল সত্য, তা পরে আসব 'খন।

—আচ্ছা মাসীমা।

মাসীমা চলে যেতেই ছবি আরক্তিম মুখে চেয়ে হাসল একটু। তারপর বলল—কি লজ্জায় আমাকে ফেলেছিলেন বলুন তো?

—আমার মনের কথাটাই ব'লে ফেলেছি মাসীমার কাছে। পরোক্ষে নিজের বিয়ের ঘটকালি নিজেই করলাম; এই জায়গায় প্রগ্রেসিভ না হ'য়েও আমি প্রগ্রেসিভ। তুমি হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন?

—এই তো খাচ্ছি।

—তুমি আমার ভাবী বধূ, এই মিথ্যে পরিচয় না দিলে মাসীমার কোঁচকানো ভুরু সোজা হ'ত না তো বটেই, হয়তো ব'লে বসতেন মেয়েদের নিয়ে বেলেল্লাপনা এখানে চলবে না বাপু, বিদেয় হও—

—তাই বলুন, মিথ্যে ক'রে কথাটা বললেন তা'হলে?

—সত্যি মিথ্যের দায়িত্ব এখন তোমার।

—অর্থাৎ আপনি আমাকে দয়া ক'রে গ্রহণ করতে চাইছেন, আমি তাতে রাজী কিনা?

—ছবি, দয়ার কথা তুমি এখাতে তুলছ কেন বলত? আমাদের কারখানায় বনস্পতির টিন ভর্তি করে ঠাণ্ডাঘরে রাখা হয় জমিয়ে ফেলার জন্যে। তুমিও তেমনি মনটাকে কুলিং রুমে রেখে জমিয়ে ফেলেছো। আমি তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাচ্ছি, এতে কি উপকার করা হবে শুধু তোমার? তোমার বাবার? আমার কোন লাভই হ'বে না? আমি তোমার মত সেবাপরায়ণা, স্নেহময়ী, কল্যাণী বধূকে জীবনে পাব, সেটা যে আমার মত চালচুলোহীন বাউণ্ডুলের পক্ষে কত বড় লাভ, সে কথা কেমন ক'রে বোঝাই?

শালপাতাগুলো ছবি ফেলবার জন্যে তুলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম—তা চলবে না, তুমি আমার অতিথি।

ছবি সহাস্যে বলল—অতিথি, কিন্তু অনাহূত।

আমি কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলাম। উত্তরটা শুনে খুবই কষ্ট পেলাম মনে মনে। সহসা একথার জবাব দিতে পারলাম না।

ছবি আমার মনের অবস্থা অনুমান করল বোধ হয়। সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—রাগ হ'ল?

আমি গম্ভীর হ'য়ে বললাম—না।

ছবি বলল—চলুন, সন্ধ্যে হ'য়ে এল। আমাকে এগিয়ে দেবেন। আর অমনি দেখাও ক'রে আসবেন বাবার সঙ্গে।

—তাই চল।

ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই ছবি বলল—বাবা প্রায়ই আপনার নাম ক'রে বলেন—ওকে বলব, তোকে দয়া ক'রে যাতে নেয়, কিন্তু ভয়ও হয় যদি কিছু ভেবে বসে?

আমি কৌতূহলী হই—শুনে তুমি কি বলতে?

—আমি কি বলতাম, সে শুনে আপনার কাজ নেই, হয়তো এখান থেকেই চলে যাবেন রাগ ক'রে।

—তা'হলে থাক, ব'লো না।

—দেখছি উভয়-সঙ্কট। মন খোলসা ক'রে কথাটা বললেন না, বুঝতেই পারছি। শুনুন তা'হলে। আমি বাবাকে বলেছি, এমন দুরাশা তুমি—

আমি প্রায় ধমক দিয়ে বললাম—ছবি, থামো তুমি।

ছবি শান্ত মেয়েটির মত চুপ ক'রে গেল। ওর পিছন পিছন গিয়ে দাঁড়ালাম জগমোহনবাবুর রোগ শয্যার পাশে।

১৫

সামর্থ্যে না কুলালেও উঠে বসলেন জগমোহনবাবু। ছবি যে আমাকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে আসবে, এটা হয়ত ভাবতেই পারেন নি তিনি। অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাঁর মুখখানা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল মনে হ'ল।

তিনি বললেন—বাবা সত্য এসেছ? অনেকদিন থেকে তোমাকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। এস বাবা এস। ছবি, চেয়ারখানা এই-

খানে পেতে দে—

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে কাছেই বসলাম চেয়ারটা টেনে নিয়ে। ছবি ভেতরে চলে গেল।

বললাম—আসব আসব ক'রে আসা হয়ে ওঠে না। অফিসের কাজ-কম্মো, লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আপনার শরীর কেমন?

জগমোহনবাবু বললেন—আগের চেয়ে ভাল। তবে হাঁপানির টানটা উঠলেই মনে হয় শেষ হ'য়ে গেলাম বুঝি। সে যাক্—তুমি আজ এসেছ ভারী আনন্দ হ'ল। ছুটো মনের কথা ব'লে বুকটা হাল্‌কা ক'রে নিই। ছবিকে কতদিন থেকে বলছি, বন্ধুকে পাঠিয়ে খবর নে ; নইলে একদিন যা --কেন সত্য আসে না। তা মেয়ে বন্ধুকেও পাঠাবে না, নিজেও যাবে না। দোষের মধ্যে আমি ওর কাছে কথায় কথায় একদিন ব'লে ফেলেছি, সত্য ছেলেটি বড় ভাল। তার হাতে তোকে দিতে পারলে নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারতাম। এই শুনেই মেয়ে বেঁকে বসল। বলল কি জানো? বাবা এমন দুরাশা তুমি কোনদিন কোরো না। আমার বিয়ের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমিই বলত বাবা সত্য, তোমার কাছে আমি কথাটা তুলব, এতে অন্যায়টা কি হ'ল? হাজার হোক, আমি মেয়ের বাবা। শুনে ছবি বলল, এতে তুমি নাকি আমাদের স্বার্থপর ভাববে। সত্যিই কি তুমি সে রকম ভাববে আমাদের —না, না, চুপ ক'রে থেকো না—হ্যাঁ বা না একটা জবাব তোমাকে দিতে অনুরোধ করছি বাবা সত্য—চুপ করে থেকো না—

জগমোহনবাবুর কথা শুনতে শুনতে মনের যে কী ভাব হচ্ছিল, ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। ছেলেবেলায় আমার মা-বাবা স্বর্গে গেছেন, চাল-চুলো বলতে কিছুই নেই। মামার বাড়ীতে মানুষ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই করতে হয়েছে সেখানে। সাবালক হ'য়েই নিজের পথ দেখে নিয়েছি। ছিলাম স্কুলে সত্তর টাকা মাইনের কেরাণী। হরুদার দয়ায় কাজ করছি বনস্পতি কারখানায়। দু'শো টাকা মাইনে। পা দিয়েছি ছাব্বিশে। তবু আজ পর্যন্ত কোনো কন্যার পিতামাতা বা

অভিভাবকের চোখে সুপাত্র ব'লে বিবেচিত হই নি। জগমোহনবাবুর চোখে আমি এখন সুপাত্র ব'লে গণ্য হলাম কি ক'রে? ছবিই বা এটা দুরাশা ব'লে ভেবে নিল কেন? খুবই আশ্চর্য লাগছিল।

কেমন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম জগমোহনবাবুর কথা শুনতে শুনতে। তিনি যখন বললেন—চুপ ক'রে থেকো না—তখন হঠাৎ হুঁস হ'ল আমার, তিনি আমায় কিছু বলতে বলছেন। লজ্জিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলতে বলছেন?

জগমোহনবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যতই স্বার্থপর ভাবো, মেয়ের ভালর জন্যেই বলছি। সব বাবাই মেয়েকে সৎপাত্রে দিতে চায়। তারপর মেয়ের ভাগ্য।

বললাম—আপনার বিবেচনায় আমি তাহ'লে একজন চলনসই পাত্র? কিন্তু জানেন তো, কিছুই নেই আমার। আমিই সঙ্কোচের সঙ্গে আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুলব ভেবেছি, কারণ ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছিল, আমার বিয়ের জন্যে আমাকেই উদ্যোগী হ'তে হবে।

জগমোহনবাবু আনন্দে চীৎকার ক'রে ছবিকে ডাকলেন—ছবি শুনে যা—সত্যর কথা শুনে যা—

ছবি হন্তদন্ত হ'য়ে এল—কি বাবা?

—সত্য নিজে থেকেই তোকে বিয়ে করতে চাইছে। আমি জানতাম, সত্যর কাছে কথাটা একবার তুললে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'য়ে যাবে।

ছবি লজ্জায় রাঙা হ'য়ে গেল। কোন কথা না ব'লে চলে যাচ্ছিল।

জগমোহনবাবু বললেন—সত্যকে এক কাপ চা ক'রে দে মা—

যেতে যেতে ছবি বলল—এক্ষুণি নিয়ে আসছি বাবা।

জগমোহনবাবু বললেন—নিজের মেয়ে ব'লে বলছি না, ছবি সত্যিই ভালো মেয়ে। যেমন চালাবে, তেমনি চলবে। ওর মনটা বড় নরম। সকলের জন্যে কিদরদ। হ্যাঁ বাবা, একরত্তি বাড়িয়ে বলছি না। তোমার একলার সংসারে ও হবে লক্ষ্মী। ওর পয়ে সব দিক দিয়ে বাড়-বাড়ন্ত হবে তোমার। আমি বলছি, দেখে নিয়ো তুমি।

ব'ললাম—ছবিকে অনেকদিন থেকেই দেখছি। আপনি ওর সম্বন্ধে কিছুই বাড়িয়ে বলেন নি। ছবির পরীক্ষা হ'য়ে যাক। আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠুন। তারপর বিয়ের ব্যবস্থা করলেই হবে।

—সে তোমরা যেমন বুঝবে, সেই রকমই কোরো। মোটের ওপর আমি নিশ্চিন্ত হলাম এতদিনে, কি বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও।

আমি আর একবার তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। ইতিমধ্যে ছবি চা নিয়ে এল।

বলল—বাবা, তোমাকে আর এখন চা খেতে হবে না, ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।

—তাহ'লে চা থাক, ওষুধই দাও।

ওষুধটা খেয়ে জগমোহনবাবু বললেন—বুঝলি মা, এখন আমি নিশ্চিন্ত। মলেও এখন আর কোন দুঃখ নেই।

—একথা বলছ কেন বাবা?

—সত্য এখন আর পর নয় মা, ঘরের লোক। আমার ইচ্ছে, তোদের চার হাত যত শীগ্‌গীর এক হয় ততই ভাল। বিয়ের পর পরীক্ষা দিতে ক্ষতি কি?

ছবি আমার দিকে সলাজ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বাবাকে বলল—সেটা তো সম্পূর্ণ ওঁর ইচ্ছে বাবা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জগমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য ক'রে বললাম—তা নয়, বিয়েটা পরীক্ষার আগে হবে না পরে হবে। সেটা ছবির ইচ্ছের উপরই নির্ভর করে।

জগমোহনবাবু সস্নেহে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাহ'লে তুইই বল মা, কি ইচ্ছে তোর?

ছবি জবাব দিতে গিয়ে ঘর্মাক্ত হচ্ছিল। পরে হয়ত বুঝল, তার মা নেই; বাবাই তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন তার কাছে। মায়ের সামনে এ

প্রশ্নের জবাব সে যেমন দিত, তেমনি সহজ ভাবেই একটু ভেবে নিয়ে বলল—পরীক্ষার পরে হ'লে ক্ষতি কি ?

জগমোহনবাবুর আর দেরী করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না বোধ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কেন মা, এতে পরীক্ষার ক্ষতি হবে ব'লে ?

ছবি শান্ত স্বরে জবাব দিল—হ্যাঁ বাবা।

জগমোহনবাবু বললেন—কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। বরং সত্যর কাছে অনেক বেশী সাহায্য পাবি পড়াশুনোয়।

সমস্ত বিতর্কের ওপর যবনিকা টানবার জন্যে বললাম—ছবির যখন ইচ্ছে, পরীক্ষার পরেই হবে।

এ কথায় জগমোহনবাবুর মন সায় দিল না। কাতর কণ্ঠে বললেন—যদি ততদিন না বাঁচি, তাই বলছিলাম—

ছবি অগত্যা বলল—তাহ'লে তোমার কথাই থাক বাবা।

ছবিদের বাড়ী থেকে যখন চলে এলাম, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। আসবার সময় ছবি দরজা অবধি এগিয়ে দিল। কৌতুক ক'রে বলল—মেসের অন্নজল এবার তাহ'লে সত্যিই আপনার উঠলো ?

হঠাৎ ছবিকে কোনও জবাব দিতে পারলাম না। আলো-আঁধারি জায়গাটাতে আমি হাতখানা ছবির দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ছবি যখন অনেক দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে আমার হাতখানা ধরল, তখন তার সারা দেহটা থর থর ক'রে কাঁপছে মনে হ'ল। তার হাতখানায় একটু চাপ দিয়ে বললাম—ঘরের অন্নজলের ব্যবস্থা পাকা হ'ল, বাঁচলাম। সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মেসের ভাত গিলিগে যাই, রাত হ'ল। ছবি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। আমি চলে এলাম।

আমি এম. এ. পরীক্ষা দেব শুনে হরুদা বললেন—আমিও দেব। সামনের বছরে প্রাইভেটে দেওয়ার বাধা থাকবে না।

আমি বললাম—এতো খুব ভালো কথা। একসঙ্গে পড়া যাবে।

—পড়বো ? তার সময় কখন ?

—তাহ'লে ? বি. কম না প'ড়ে পাস করেছেন, তাই ব'লে এম. এ. পাস করা অত সহজ নয়।
—সে দেখা যাবে। পরীক্ষার 'ফি' জমা দেবার সময় ব'লো। আমার ফি-টাও জমা দিয়ে দেব।
আমি সহাস্যে বলি—আচ্ছা।
মাসখানেক পরেই হরুদা ছুটি নিলেন অফিস থেকে। আমি তাঁর জায়গায় এ্যাকটিং করতে লাগলাম। হরুদা আর কাজে যোগদানই করেন না, একমাস পাওনা ছুটি শেষ হ'ল। 'সিক্ লিভও' শেষ হ'ল। তারপর বিনাবেতনে। ছুটির মেয়াদ বাড়িয়েই চললেন হরুদা।
বুঝতে পেরেছি, নতুন কিছু করার নেশা চেপে বসেছে তাঁর মাথায়। পার্বতী বউদির সঙ্গে কথায় বুঝেছিলাম, হরুদা চাকরী করেন এটা তাঁর পছন্দ নয়। খবর নিয়ে জানলাম, সরকারী বন্দোবস্তে তাঁর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি বিলি হ'য়েছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে। তাঁর হাতে লক্ষাধিক টাকা এসেছে। স্বাধীন ব্যবসায়ে নেমেছেন তিনি। পরীক্ষামূলক ভাবে কনট্রাক্টারির কাজ করছেন। ব্যবসায়ে সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'লে তবে কারখানার চাকরীতে ইস্তফা দেবেন।
আমি মাসের পর মাস তাঁর জায়গায় এ্যাকটিং করেই যাচ্ছি। এতে আমার কোন ক্ষতিই হচ্ছিল না; বরং আর্থিক দিক থেকে আমার সুবিধাই হচ্ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন এ্যাকটিং করতে করতে আমার মনের ভেতরে একটা অস্বস্তি হ'তে লাগল।
অস্বীকার করব না, হরুদার ওপর রাগও হচ্ছিল খানিকটা। মনে হ'ত, দু'নৌকোয় পা না দিয়ে হরুদার উচিত একটা দিকঠিক ক'রে নেওয়া। হয় পুরোপুরি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ, নয় চাকরীতে যোগদান করা। একথা যখন ভাবতাম তখন নিজেকে ভয়ানক স্বার্থপর মনে হয়। বেশ বুঝতাম, হরুদার ওপর অবিচার করছি। তাঁর পদের ওপর আমার লোভ জন্মেছে। ভেবে দেখতাম না, হরুদা চাকরী ছাড়লেই তাঁর পদটা আমি নাও পেতে পারি। কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী ভেকেন্সির

নোটিশ পড়বে। যদিও বাইরের প্রার্থীকে নেওয়া হবে না, তাহ'লেও আমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই প্রার্থী হবে। আমার চেয়ে যোগ্যতর প্রার্থীর অভাব নেই। সিলেকসানে হয়ত আমি দাঁড়াতেই পারব না। তবু মনে হ'ত, যেহেতু আমি এতদিন হরুদার জায়গায় কাজ করছি, অতএব ঐ পদে আমিই নির্বাচিত হব। অন্ততঃ তাই হওয়াই ন্যায়সঙ্গত।
অনেকদিন জল্পনা কল্পনা চলল এই ব্যাপারটা নিয়ে। হরুদা তখন আমাদের মধ্যে প্রাত্যহিক আলোচ্য ব্যক্তি। টিফিনের সময়ে স্টাফ লাউঞ্জে বসে তাঁর প্রসঙ্গই উঠত। বচসা হ'ত ছ'দলে। একদল ব্যবসায়ে তাঁর লাভের অঙ্ক স্ফীত ক'রে দেখিয়ে বলতেন—গাঙ্গুলি এখানে যা বছরে রোজগার করত, এখন সেটা তার মাসিক আয়।
প্রতিপক্ষ একথা মানতে চাইতেন না। গলা চড়িয়ে বলতেন—ব্যবসায় আর সেদিন নেই মশাই। এটা যদি সত্যি হ'ত, তাহ'লে গাঙ্গুলি কবে চাকরী ছেড়ে চলে যেতেন।
দিনের পর দিন তাঁকে নিয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি হ'ল একদিন। হরুদা রেজিগনেশান লেটার সাবমিট করলেন। সারা ফ্যাক্টরীর লোক খবরটা শুনে মুষড়ে পড়ল। হরুদা ছিলেন কারখানার শ্রমিকদের পরিত্রাতার মত। আপদে বিপদে বুক দিয়ে লোকের উপকার করেছেন। তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে ঝগড়া করেছেন ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে। হরুদা ছিলেন প্রকৃত শ্রমিক দরদী। কারখানা ছেড়ে তিনি চলে যাচ্ছেন শুনে সকলে হায় হায় করল।
হরুদা ছল ছল চোখে বিদায় নেবার আগে যার সঙ্গে দেখা হয় তাঁকেই বলেন—আমি চাকরী ছাড়ছি কিন্তু তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি না। এ কারখানায় আমাকে নিশ্চয়ই আসতে হবে। ব্যবসার খাতিরে যত না, তার চেয়েও তোমাদের ভালবাসার আকর্ষণে।
আমি কেবলই ভাবি, হরুদা শুধু আমাকে চাকরীই দেন নি—আমার উন্নতির পথও প্রশস্ত ক'রে গেছেন তিনি।
মা-বাবা ছাড়া জীবনে আমি ছুটি মানুষের ঋণ শোধ করতে পারব না।

একজন আমার মামা। আর একজন হরুদা।

১৬

বনস্পতি কারখানার কর্ম জীবনে এইভাবে গড়িয়ে যায় চার চারটে বছর।

ছবির সঙ্গে বিয়ের কয়েকমাস পরেই আমার পদোন্নতি হ'ল। মনে পড়ল, জগমোহনবাবু অর্থাৎ আমার শ্বশুর মশায় বলেছিলেন, ছবির পরে তোমার বাড় বাড়ন্ত হবে। স্ত্রীভাগ্যে ধন দেখলাম সত্যি সত্যি ফলে গেল।

প্রথম যেদিন ছবির হাতের রান্না খেলাম, মনে হ'ল অমৃত। ছবি কি সুন্দর মিহি ক'রে আলুভাতে মাখে। দেখলে মনে হ'ল, খোসা ছাড়ান গোটা আলুটাই দিয়েছে আগ্ পাতে। কিন্তু টিপলেই বোঝা যাবে মাখনের মত নরম। প্রথমদিন দেখে শক্ত হাতে টিপতে গিয়েছিলাম, ছবি আমার অবস্থা দেখে হেসে উঠেছিল।

তারপর সবই মিষ্টি লাগতে থাকল। ছবি আমার কল্যাণে সিঁথিতে সিঁদূর দেয়, হাতে নোয়া পরে, শাঁখা পরে পতিপরায়ণা মহিলার মত। ছবি ঘর গোছায়, রান্না করে, সকলের প্রতি কর্তব্য করে ধৈর্যের সঙ্গে। তারপর রাত্রে পরীক্ষার পড়া তৈরী ক'রে ঘরের এক পাশে। অন্য পাশে আমি পড়ি। এক সময় ছবি এসে পিঠের ওপর সারা শরীরের ভর দিয়ে বলে—আজ থাক, এসো।

তুজনে শয্যার আশ্রয়ে ঘনিষ্ঠ হই।

বনস্পতি এখন আমাদের খাদ্যের অপরিহার্য উপকরণ। আমাদের দেহে স্নেহপদার্থের অভাব দূরে করে বনস্পতি। এরই কল্যাণে আমার রুজিরোজগার। যা নিয়ে আসি উপার্জন ক'রে, ছবি তাই থেকে কেমন

স্বচ্ছলভাবে সংসার চালায়। অসুস্থ পিতার সেবা করে, ভাইদের স্নেহ করে ; ছবি বলে,—ভাইরা যতদিন মানুষ না হয়, ততদিন নিজেরা আলাদা হবার কথা ভাববো না। বঙ্কু যেদিন রোজগার ক'রবে, ওর বিয়ে থা দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাব নিজেদের ঘরে। আমাদের সঞ্চয় থাক মাসে কিছু কিছু ক'রে। আমাদের নিজেদের বাড়ী তৈরী করতে হবে। ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হবে।

আমার সঙ্গে হরুদা পরীক্ষার 'ফি' জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। বিরাট ব্যবসা ফেঁদে তখন তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। চারদিকে লক্ষ লক্ষ টাকার কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছেন। তাঁর পরীক্ষা দেবার সময় কোথায় ?

আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান পেয়ে গেলাম। স্কুলে কেরাণীগিরি করবার সময় মনে মনে সাধ হ'ত শিক্ষকতা করার। কত সম্মানের চাকরী। স্কুলের সহকারী শিক্ষক কৃতান্তবাবু প্রধান শিক্ষক রবীনবাবুকে ব'লেছিলেন আমাকে দু' একটা ক্লাসে পড়াবার সুযোগ দিতে। কর্তৃপক্ষ নাকি রাজী হন নি। অথচ আমার খুব ইচ্ছে হ'ত ছেলেদের পড়াতে।

কাছাকাছি একটা কলেজে পার্টটাইম অধ্যাপকের পদ পেলাম। মনের সাধ মিটল এতদিনে।

কলেজে নৈশ বিভাগে শুধুই বাণিজ্য পড়ানো হয়। বাংলার পার্টটাইম লেক্‌চারার হ'য়ে কাজ ক'রে যাচ্ছি। আমার তখন দ্বৈত সত্ত্বা। দিনে কেরাণী, রাতে অধ্যাপক। দুই বিপরীত সত্ত্বার নিষ্পেষণে আমার অবস্থা দাঁড়াল দু' নৌকোয় পা দেওয়ার মত।

কিছুদিন কলেজে কাজ করার পর হেড্ অফ্ দি ডিপার্টমেণ্ট রমণীবাবু একদিন বললেন —সত্যবাবু, ফুলটাইমার একজন নেওয়া হবে ; আপনি রাজী থাকেন তো বলুন—আপনার কাজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল খুবই সন্তুষ্ট—আপনি রাজী থাকলেই হয়ে যাবে।

—কিন্তু তাহ'লে যে বনস্পতি কারখানার চাকরিটা ছাড়তে হয়।

—কারখানার চাকরী ছাড়তে আবার মায়া কি মশাই? এ লাইনে পয়সা না থাক, মর্যাদা সম্পর্কে তো কোন প্রশ্ন ওঠে না?

—ভেবে দেখি।

অনেকদিন ধ'রে ভেবেছি। ভেবে ঠিক করেছি, কারখানার জীবনের সঙ্গে আমি আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি। এর থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। কারখানার প্রতিটি মানুষ আমার চেনা। দীর্ঘদিন এদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। কারখানার মধ্যে দেখেছি, গোটা পৃথিবীকে। বিশ্বের মানুষকে দেখেছি এখানে। এখানেই মানুষকে ভালবাসতে শিখেছি। প্রতিটি শ্রমিক, সহকর্মীদের সঙ্গে স্নেহের অচ্ছেদ্য ডোরে বাঁধা পড়েছি। এ ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়।

মনে হ'ল ঐ সমাজে আমি একেবারেই অবাঞ্ছিত। খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না কিছুতে। দূর থেকে মনে হ'ত, শিক্ষিত, ভদ্রপোষাক-পরিহিত মানুষগুলি সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত। কাছে গিয়ে ভুল ভাঙল। দেখলাম, এখানে অবিচার চলে। তথাকথিত সম্মানিত ব্যক্তিরা রুচি বিগর্হিত কথা বলেন। মিথ্যা কথা বলতে বাধে না, ভাঁওতা দিয়ে অপরের কাছ থেকে টাকা ধার করতে বাধে না এঁদের। এমন কি তরুণ এক অধ্যাপকের কীর্তি শুনলাম, ছাত্রীর দুর্বলতার সুযোগে তার গয়না পর্যন্ত হাত পেতে নিয়ে সরে পড়তে ইতস্ততঃ করেন নি।

আমি মানি, এ হয়তো আমার সবটুকু দেখা নয়। ভালোও আছেন। কিন্তু তাঁরা নির্বিকার ব'লেই ভালোমানুষী বজায় আছে তাঁদের।

আবার কিছুদিন পরে রমণীবাবু তাগাদা দিলেন—কি মশায়, কি ঠিক করলেন? আমার এ্যাডভাইস যদি নেন, তাহ'লে চলে আসুন। এখানে পার্টটাইমার হিসেবে আপনি কত পান? বলতে গেলে কিছুই না। কিন্তু এটা আপনাকে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান দিয়েছে, কারখানার কেরাণী হিসেবে তা কোনদিন পেতেন কি?

আমি জবাব দিলাম—মাফ করবেন রমণীবাবু, কারখানার চাকরী ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রমণীবাবু বললেন—ফুলটাইমার হিসেবে অন্য কাউকে এ্যাপোয়েন্ট করা হ'লে আপনাকে তখন দরকার হবে না, সেটা ভেবে দেখবেন।

—ভেবেছি। জানেন রমণীবাবু, আমার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আছেন। তাঁর নাম হরদেব গাঙ্গুলী। হাই ক্যালিবারের লোক। চাকরী ছেড়ে ব্যবসা করছেন। বেশ ভেবেচিন্তেই চাকরী ছেড়েছেন তিনি। আর আমি বেশ ভেবেচিন্তেই ফুলটাইমার হয়ে অধ্যাপনাকেই পেশা করতে পারলাম না।

—একথা বলছেন কেন সত্যবাবু?

—কেন বলতে হচ্ছে একথা শুনতে চান? তাহ'লে বলি, শুনুন রমণীবাবু। কারখানার অশিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে মিশেছি; এখানে শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গেও মিশলাম। এখানে শিক্ষিত মানুষদের নোংরামি দেখে অশিক্ষিত শ্রমিকদের অনেক সভ্য মনে হয়েছে মশাই। প্রোফেসারী মাথায় থাক, আমার কারখানার কেরাণীগিরিই সহস্রগুণে ভাল।

শুনে রমণীবাবু মুখখানা অন্ধকার ক'রে বললেন—ঠিক আছে।

এইরূপে এক মহৎ সম্মানের পেশাকে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে এলাম।

সেদিন শ্রমিকদের মধ্যে মিশে যখন কারখানায় প্রবেশ করলাম, তখন মনে হ'ল, আমি এদেরই একজন। এদের ছেড়ে যাবার সাধ্যি নেই আমার। সমস্ত ডিগ্রীগুলোর প্রয়োজন মিটেছে। আমি সুখী।

ছবি সর্বান্তঃকরণে আমার এই মনোভাবকে সমর্থন করল।